নূতন ঊষা

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

অরুণিমা প্রকাশনী

প্রথম সংস্করণ—১৩৬৪

প্রকাশক—

অরুণিমা প্রকাশনী

২, জগবন্ধু মোদক রোড

কলিকাতা—৫

মুদ্রাকর—

অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২, জগবন্ধু মোদক রোড

কলিকাতা—৫

প্রচ্ছদ—সুব্রত দত্ত

বাঁধাই—চক্রবর্তী বাইণ্ডার্স

উৎসর্গ

শ্রীমতী রমলা মজুমদার
শ্রীসন্তোষ মজুমদার

করকমলে—

এই লেখকের—

কলকাতার কাছেই
রাত্রির তপস্যা
রজনীগন্ধা
পুরুষ ও রমণী
বহুবিচিত্র
মনে ছিল আশা
স্বর্ণমুকুর
দুর্ঘটনা
ভাড়াটে বাড়ী
জন্মেছি এই দেশে
ছুটি
আবছায়া
কমা ও সেমিকোলন
প্রেরণা
সীমান্তরেখা
রাতমোহানা
চতুর্দোলা
কোলাহল
স্মরণীয় দিন
কেতকী বন
নববধূ
মিলনান্ত
চাঁদমালা
নবযৌবন
মালাচন্দন
জ্যোতিষি
সমারোহ
কাছে আছে যারা

অন্তরাগ

উড়িষ্যার এক সহরে পৌঁছে এক নব পরিচিত বন্ধুর বাড়ী অতিথি হলাম। বন্ধু অমিয়বাবুর বাবা বড় উকিল, বাড়ীটিও সেই পরিমাণে বিরাট। অনেকখানি বাগান চারিদিকে, তারই মধ্যে প্রকাণ্ড দোতালা বাড়ী। একেবারে নতুন বাড়ী, আগা-গোড়া অধুনিক বন্দোবস্ত। অতিথির জন্য একটি পৃথক ঘরই আছে, খাট, আলনা, টেবিল, চেয়ার, ড্রেসিং-টেবিল, টেবিল-ল্যাম্প, আলো—সুসজ্জিত। সঙ্গেই বাথরুম। ঘরের সামনে একটু বারান্দা—সেটিও যেন মূলবাড়ী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বস্তুত বাড়ীর দিকে পেছন-ফেরা সেটা। বারান্দার সামনে এক ফালি নিজস্ব বাগান, পাঁচিল—পাঁচিলের কোল বেয়ে চওড়া একটা নালা—আর ওপাশে অনেকখানিব্যাপী এক আমবাগান। গরমের দিন—সিঁদুরে রঙের আমে বোঝাই হয়ে আছে গাছগুলি। বহুকালের বড় বড় গাছ—তার ফলে জায়গাটা ছায়ামধুর ও স্নিগ্ধ হয়ে আছে, সেদিকে চাইলে আরাম লাগে।

অমিয়বাবুর এই ঘরটি আমার বড় ভাল লাগল। একটা দোর খুললেই সমস্ত বাড়ীটার সঙ্গে যোগাযোগ হ'তে পারে—দোরটা বন্ধ করলেই সম্পূর্ণ পৃথক একটি জগৎ। একেবারে নির্জন। সহরের বাড়ী, ওদিকে দাঁড়ালেই জনতা ও গাড়ী-ঘোড়ার ভীড়—অথচ এই বারান্দাটা এমন একান্তভাবেই উত্তর দিকের এই আমবাগানের দিকে ফেরান যে একটি কোণ ছাড়া শহরের কোন অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। সম্বলপুর সহর যেন দূর থেকে এই বাগানটিকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে, এই ভূখণ্ডটি রয়ে গেছে—বোধ করি একশ বছর আগেকার পৃথিবীতে। ভারি ভাল লাগল আমার জায়গাটা। বিশেষত সারারাত

অগ্নি-বৃষ্টির পর ভোরে যখন ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করত, তখন সেই নির্জন বারান্দায় চুপ ক'রে বসে থাকতাম বহুক্ষণ ধরে। দূরে সহরটা জেগে উঠত একটু একটু করে, তার আভাস পেতাম কিন্তু আমার সামনের সেই আমবাগানে একটি মানুষের পদশব্দও জাগত না। নির্জন নিস্তব্ধ ছায়াচ্ছন্ন সেই বাগান একটি রহস্যভরা অস্তিত্ব নিয়ে শান্ত হয়ে বসে থাকত আমার মুখোমুখি। রাত চারটেয় আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত তখন থেকেই বেরিয়ে এসে বসতাম, ছটা নাগাদ চাকরে চা দিয়ে যেত একবার—চা খেতাম সেখানে বসেই। একেবারে আটটা নাগাদ বন্ধুবর এসে তাড়া লাগালে তবে উঠে স্নান করতে যেতাম। সন্ধ্যার আগেও যখন ছায়া ঘনিয়ে আসত আবার তখন যেন নতুন আর এক রূপ ধরত বাগানটা কিন্তু সেটা দেখবার বিশেষ অবসর মিলত না। সভাসমিতি, নিমন্ত্রণ, সহর ভ্রমণ, কাছাকাছি বিখ্যাতস্থানগুলি দেখা—একটা না একটা ব্যবস্থা করেই রাখতেন অমিয়বাবু। আমি ঘুরতাম, কিন্তু মনটা পড়ে থাকত সেই আমবাগানে ও সেই বারান্দায়। বাগানটা আমাকে এমনি পেয়ে বসেছিল!

প্রথম দিন লক্ষ্য করিনি, তার কারণ সকালে পৌঁছে খানিকটা হৈ-হৈয়ের মধ্য দিয়েই কেটে গেছে,—দ্বিতীয় দিনেই প্রথম নিরিবিলি বসবার সুযোগ পেলাম—আমবাগানটি শুধুই বাগান নয়, সেটি গোরস্থানও বটে এবং সঙ্গে সঙ্গে, গাছভর্তি পাকা আম থাকা সত্ত্বেও ছেলের দল আমতলায় এসে জড় হয়নি কেন, তার কৈফিয়ৎটাও পেয়ে গেলাম।

পুরানো গোরস্তান। গুটি-পাঁচেক মাত্র বাঁধানো সমাধির অস্তিত্ব আছে; আর গুটি কতক ভাঙ্গাচোরা ছচারখানা ইট বা পাথর বহন

ক'রে কোনমতে নিজেদের চিহ্নমাত্র বজায় রেখেছে; কয়েকটা জায়গায় মাটি ঈষৎ উঁচু হয়ে আছে এখনও—হয়ত ওগুলোর নিচেও নরকঙ্কাল পাওয়া যাবে খোঁজ করলে—বহুকালের বারিবর্ষণে বাকী সব মাটির সঙ্গে সমান হয়ে গেছে, বিরাট আমগাছগুলি তাদের গুঁড়ি বিস্তৃত ক'রে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে হয়ত বা। আজ আর ঠিক ক'রে বলা শক্ত, কোন্‌খানে সমাধি আছে, কোনখানে নেই।

অমিয়বাবুকে প্রশ্ন ক'রে জানলুম ডানদিকের ঐ ছোট পাহাড়টা ঘেঁষে এককালে এখানে ফৌজের ছাউনি ছিল। তারই স্মৃতি বহন করছে ঐ পলটন কুয়া নামে মাঠের মধ্যেকার বড় ইঁদারাটা। একশ-বছর আগে, অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানে ইংরেজ ফৌজেরও সমাবেশ হয়েছিল। সেই ফৌজের আমলেই মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের গোরস্তান ছিল এইখানে। অনেকগুলো ভেঙ্গে চুরে গেছে, কেউ কেউ সে সব নিশ্চিহ্ন ক'রে বাড়ী-ঘরও করে ফেলেছেন—এই সামান্য জায়গাটুকু আজও আছে। তবে এখন আর এখানে কেউ গোর দেয় না, এখন গোরস্তান হিসেবে অন্য জমি ব্যবহার করা হয়।

বিকেলে একটু বেলা থাকতেই, অর্থাৎ কাছারীর ফেরৎ উকীল-বাবুরা বাড়ী পৌঁছবার আগেই, একা বেরিয়ে পড়লাম। আমবাগানে ঢুকে বেড়াতে লাগলাম সেই সমাধিগুলির মধ্যে। অপূর্ব একরকম মনের ভাব হ'তে লাগল। মনে হ'ল কারা এরা, কবে এসেছিল এই পৃথিবীতে—কত কী ক'রে, কত অপূর্ণ সাধ আহ্লাদ বুকে নিয়ে আবার পৃথিবী থেকে চলে গেছে। হয়ত আজও এদের কিছু বলবার আছে, সেই অকথিত কথা এইখানে সামান্য এই ক'খানি ইষ্টকখণ্ডের মধ্যে গুমরে মরছে।

ঘুরতে ঘুরতে একটি সমাধির সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হ'ল।

বিরাট আমগাছের ঠিক নিচে সমাধিটা, এখনও অটুট আছে। কিন্তু বিস্ময় সে জন্যে নয়, তার ওপরে ঘন একটি মাকড়সার জালের আস্তরণ, এমনভাবে সেটি বিভিন্ন গাছের ডালে আট্‌কে বোনা হয়েছে যে দেখাচ্ছে যেন একটি চাঁদোয়ার মতই। শুধু তাই নয়, মাকড়শা জাল বোনে গোল ক'রে—এটি চতুষ্কোণ। চারকোণা মাকড়শার জাল এই প্রথম দেখলাম, কোন প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌ কাছাকাছি থাকলে জিজ্ঞাসা ক'রে নিতাম যে এটা স্বাভাবিক কি না।

চারদিকে ফিরে ফিরে দেখলাম, আর কোন সমাধির ওপরই ত এরকম জাল নেই। হয়ত গাছের খাঁজে কোথাও একটু আধটু থাকতে পারে—কিন্তু এভাবে? না, আর নেই।

কী খেয়াল হ'ল, হাতে ছড়ি ছিল—ছড়ির ডগা দিয়ে জালটা ছিঁড়ে দিলাম। বেশ ভাল ক'রেই ছিঁড়লাম। কোথাও তার কোন অস্তিত্ব রইল না। মাকড়শাটা আগেই কোথায় চলে গিয়েছিল—তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

তারপর অবশ্য কথাটা আর মনে ছিল না, দূরবর্ত্তী এক প্রাচীন শিবমন্দির দেখে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরেছিলাম, ভোরে যখন ঘুম ভাঙ্গল তখনও সেই নির্জন মন্দির এবং তার সংলগ্ন বিচিত্র কুণ্ডটির কথাই মনে পড়ছিল, সঙ্গে ছিলেন একজন স্থানীয় এম-এল-এ, তিনি গাড়ীতে যেতে আসতে এখানকার নানা বিচিত্র ঐতিহাসিক কাহিনী শোনাচ্ছিলেন—মন সেই রসেই ডুবে ছিল।

যত রাতেই শুই—গরমের জন্যই হোক, অথবা এখানে তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত ফরসা হয়ে যাবার জন্যই হোক—ঠিক সওয়া চারটেয় ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। উত্তপ্ত ঘরের বিজলীপাখা বন্ধ করে বাইরের ভোরাই ঠাণ্ডা বাতাসে এসে বসলাম। তখনও চারিদিক নির্জন, দূরে,

বহুদূরে ক্ষীণ আর্তনাদ তুলে একটা গরুর গাড়ী যাচ্ছে কোণাকুণি সহরের যে পথটুকু দেখা যায়—সে পথও সম্পূর্ণ জনবিরল। শুধু গাছে গাছে নানা স্থুরে নানাভাষায় অসংখ্য পাখী ডাকছে। সে ঐক-তানে স্নায়ু সজাগ হয় না বরং যেন মুগ্ধ হয়ে আসে। সেই দিকে কান পেতে থাকতে থাকতে ভোরাই মিষ্টি বাতাসে চোখ ছুটি আমারও তন্দ্রায় বুজে আসছিল, এমন সময় হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলাম।

ওকি—

কাল সেই সমাধিটার ওপর থেকে লূতাতন্তুর যে চন্দ্রাতপ আমি নিজে হাতে ছিঁড়ে দিয়েছি, আজ আবার তা পূর্ণ-গৌরবে অবস্থান করছে। শেষ রাত্রের শিশির পড়ে আজ তা এখান থেকেই স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আবার এক একটি ঘনীভূত শিশির-বিন্দু মুক্তোর মতই জ্বল্ জ্বল্ করছে তার মধ্যে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

সেই চতুষ্কোণ চন্দ্রাতপ। সদ্য নির্মিত ব'লে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এমনই সুক্ষ্ম কারিগরি যে শিশির না জমলে হয়ত এখান থেকে দেখাই যেত না।

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে বসে রইলাম। মাকড়শাটাকে ত কাল কোথাও দেখিনি। কোথা থেকে আবার এল এবং এমন নিখুঁতভাবে এই জালটি রাতারাতি বুনল। ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম আর কোনও সমাধির ওপর এরকম জাল নেই। কোন কোন গাছের ওপরের ডালে ছু-একটা বিশ্রী ধূম-মলিন পুরোণো জাল আছে বটে। কাল বিকেলে তাও দেখা যায়নি, ভোরাই শিশিরের দৌলতে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিন্তু এমন পরিপাটী কোনটাই নয়। আজ আরও একটা

জিনিস দূর থেকে লক্ষ্য করলাম, সমাধি বেদীটি ঠিক যতটা লম্বা এবং চওড়া, চন্দ্রাতপটিও তাই।

একটু পরেই অমিয়বাবু স্বয়ং আমার 'বেড-টী'র কাপ হাতে ক'রে এসে বসলেন। কথাটা তাঁকে বললাম আজ। তিনি ত স্তম্ভিত। স্পষ্টই স্বীকার করলেন, তাঁরা কোনদিনই এটা লক্ষ্য করেন নি। এতকাল এইখানে বাস করছেন—এবাড়ী নতুন হ'লেও দুতিন বছর ত হয়েই গেছে—অথচ কোনদিন এই বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়েনি তাঁর, এও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। লক্ষ্যত করেনই নি—এখনও বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না, বললেন, 'ওটা একটা প্রাকৃতিক খেয়াল মাত্র। মাকড়শাটার খেয়াল। অথবা ওখানে ওর ঐরকম জাল বুনলেই সুবিধে হয় তাই—"

আমি কিন্তু অত সহজে ভুললাম না, সেদিন বেলা চারটে নাগাদ উঠে বাগানে বেড়াতে গিয়ে লাঠির ডগা দিয়ে ছিঁড়ে দিলাম জালটা। বেশ ভাল ক'রে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলাম।

সেদিন কথাটা মাথায় ছিল। চাঁদনী রাত, রাত্রেই শোবার আগে অমিয়বাবুকে টেনে নিয়ে যেতে চাইলাম, তিনি রাজী হলেন না। বললেন, তাঁর মা আর স্ত্রী তাহ'লে রক্ষা রাখবেন না। মায়ের এক ছেলে তিনি—আবার নববিবাহিত। কথাটা বুঝলাম। কিন্তু আমাকেও তিনি যেতে দিতে রাজী হলেন না। বললেন, 'ভূত না মানুন মশাই, আশা করি সাপ মানেন। এই রাত্তিরে আর বাহাদুরী করতে গিয়ে কাজ নেই—। প'ড়ো ডাঙ্গা জমি—সাপখোপের হেড কোয়ার্টার।' সুতরাং তখন যাওয়া হল না। তবে কথাটা ভুলিনি। উত্তেজনায় ভাল ক'রে ঘুমোতে পারলাম না। স্বপ্নেও দেখলাম বিরাট এক মাকড়শা কঠিন জালে আমার সর্বাঙ্গ জড়াচ্ছে—

চারটেরও আগে ঘুম ভেঙ্গে গেল পরদিন। একরকম ছুটেই বাইরে চলে এলাম! ...ঐত পরিষ্কার চাঁদোয়া খানি দুলছে বাতাসে, শিশিরে তেমনি ঘনীভূত ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আসে-পাশে আর কোথাও না, অন্য কোন সমাধি-বেদীর উপরে নেই সে জাল—

সকালে জলখাবার খেতে বসে অমিয়বাবুর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঐ সমাধিটা কার—কিছু জানেন নাকি—?' ভদ্রলোক খুব নাম-করা উকীল। হার্ড ফ্যাক্‌ট্‌স্ বা কঠিন তথ্য নিয়ে তাঁর কারবার, স্বপ্নবিলাস বা কল্পনা ধারে-কাছে থাকলে কখনই এত পয়সা করতে পারতেন না, তিনি হেসে বললেন, 'ওসব উদ্‌ভুট্টি কথা নিয়ে মাথা ঘামালে ত আমার চলবে না মশাই, আমার অত সময় কোথায়! আপনারা লেখক মানুষ, সব রকম তুচ্ছ কথা নিয়ে সময় নষ্ট করাই আপনাদের সাজে।'

অমিয়বাবুকে বার বার অনুরোধ করলাম যে এই বিষয়ে কিছু জানা যায় এমন কারুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে—কিন্তু তিনিও ব্যস্ত মানুষ, এসব খেয়াল রাখতে গেলে তাঁর চলে না। অথচ দিনের পর দিন দেখতে লাগলাম সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এমন কি সাড়ে পাঁচটার সময় জাল ছিঁড়ে দিয়ে সাতটার সময় টর্চ হাতে ক'রে গিয়ে দেখেছি জাল তৈরী হয়ে গেছে।

অবশেষে নিজেই খুঁজে বার করলাম লোক।

সেই এম-এল-এ বন্ধুটিই সন্ধান দিলেন। এখানকার স্থানীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর যিনি বৃদ্ধ পূজারী, তাঁর বাবা এখনও জীবিত আছেন। অন্তত একশ দশ বছর বয়স তাঁর। মিউটিনির আমল—যখন ঐ গোরস্তান ব্যবহৃত হ'ত—তখন তাঁর বেশ জ্ঞান হয়েছে। তাছাড়া লোক-মুখেও কিছু পরে শোনবার সুযোগ মিলতে পারে। নিচের

দিকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে ব'লে উঠতে পারেন না কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তি নাকি এখনও অটুট আছে তাঁর !

বন্ধুটি পরের দিন সেই পূজারীর কাছে নিয়ে যেতে রাজীও হ'লেন। দিনের আলোয় নাকি তিনি চোখ চাইতে পারেন না—কথা হ'ল রাত্রে আমাকে নিয়ে যাবেন। গেলাম রাত্রে। মহানদীর কাছে একটি ব্রাহ্মণ পল্লী, অধিকাংশ বাড়ীই পাকা গাঁথুনী কিন্তু খড়ের চাল, তা আবার অত্যন্ত নিচু। জানলার বালাই বিশেষ নেই, কোন কোন বাড়ীতে ছোট্ট কুলুঙ্গীর মত একটু গবাক্ষ আছে, তাইতেই বোধ করি ওদের চলে যায়। বেশী হাওয়াটা সম্ভবত এদের পছন্দ নয়।

এমনিই একটি বাড়ীর বাতাসহীন ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। একটা ছোট্ট পিদীম মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্বলছে এককোণে, তাতে কিছুই ভাল ক'রে দেখা যায় না। বরং একটা রহস্যময় ভয়াবহ আবহাওয়া সৃষ্টি করে সেই আলোতে। শুধু ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখলাম। মাদুরের ওপর পা ছড়িয়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বসে আছেন একটি বৃদ্ধ। যে বালকটি আমাদের নিয়ে গিয়েছিল সে-ই ওঁর পা দুটি মুড়ে দিয়ে গেল। ওঁর নিজের কোন শক্তি নেই। সারা ঘর থেকে ভ্যাপ্‌সা একটা গন্ধ আসছে, তার সঙ্গে চুয়াযুক্ত গুণ্ডির গন্ধ। বৃদ্ধ দন্তহীন মাড়িতে অবিরত পান চিবুচ্ছেন। আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় তোলবার চেষ্টা ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'কে ?' আমার বন্ধু এগিয়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে পরিচয় দিলেন। আমিও তাঁকে প্রণাম ক'রে মাদুরে বসলাম। অসহ্য গরম—কিন্তু সে সব গ্রাহ্য করতে গেলে চলবে না, বন্ধুর অভিজ্ঞতা আছে, তিনি দেখলাম পকেটে করে একটি ভাঁজ করা ছোট্ট পাখা এনেছেন।

পূজারীজীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। দেখলাম সত্যিই বৃদ্ধের চিন্তা ও ধারণাশক্তি এখনও বেশ পরিষ্কার রয়েছে। তিনি আমার প্রশ্নটা শুনে খানিকটা চোখ বুজে বসে থেকে বললেন, 'ও, বুঝেছি—আপনি কোনটার কথা বলছেন।....বাবু, আপনাকে আজ আমি একথার উত্তর দেব না। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, এখন বোধ হয় রাত আটটা বাজে—আপনি এখনই চলে যান! রাত নটার সময় দ্বিতীয় প্রহর পড়বার ঠিক মুখে ঐ সমাধির কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন।...তারপর কাল আসবেন। আমার কাহিনী শুনতে গেলে আপনি ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবেন না। এদিন সহজে পাবেন না, দৈবাৎ আজ এখানে হাজির আছেন। বছরে এই একটি দিনেই এ ঘটনা ঘটে—'

তখনই উঠে পড়লাম। আটটা তখন বেজেই গেছে—সৌভাগ্যক্রমে আমার বন্ধু তাঁর গাড়ী এনেছিলেন, তাই কোন মতে নটার আগেই অমিয়বাবুর বাড়ী পৌঁছলাম। ওড়িয়া বন্ধু সঙ্গে রইলেন, তিনি অমিয়-বাবুকে ডেকে নিতে চাইছিলেন, আমি বারণ করলাম। কী দরকার—মায়ের এক ছেলে, তাঁকে এসব ঝামেলার মধ্যে টেনে কাজ নেই।

সঙ্গে টর্চ ছিল না কিন্তু সেজন্য আজ আর অসুবিধা নেই, চাঁদনি রাত, ফুট ফুট করছে জ্যোৎস্না। ঘন-পল্লব আমগাছের ছায়া এক এক জায়গায় খুব নিবিড় হলেও পথ দেখে চলতে কোন অসুবিধা হ'ল না।

সমাধিটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম—ঠিক নটা। কিন্তু কৈ, কিছুইত নেই। কোন রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর অনুভূতি ত হচ্ছে না। বন্ধুর দিকে চাইলাম। তিনি চুপি চুপি বললেন, 'এখনও তিন মিনিট বাকী আছে। আপনার ঘড়ি বোধ হয় ফাস্ট আছে একটু—'

তা হবে। মনে পড়ল ইদানীং দৈনিক আধ মিনিট ক'রে ফাষ্ট যাচ্ছে বটে। মেলানোও হয়নি ক'দিন—

তিন মিনিট নয়, আরও মিনিট পাঁচেক পরে টের পেলাম ব্যাপারটা।

অকস্মাৎ মনে হ'ল ধূপের গন্ধ বেরুচ্ছে। ঠিক সাধারণ ধূপ নয়; কস্তুরী-চন্দন-লবান দেওয়া ধুনোর মতই সুবাস কতকটা। আরও একটু পরে পেলাম ফুলের গন্ধ, রাশি রাশি চাঁপা ও বেলফুল। তার সঙ্গে মৃদু চন্দনের সৌরভ। মনে হ'ল কোন দেবমন্দিরে উপস্থিত হয়েছি পূজার সময়।

অবাক হয়ে গেলাম আমরা দুজনেই। জনমানব নেই ধারে কাছে। একটা কোন জীবিত প্রাণী পর্য্যন্ত নজরে পড়ে না। অথচ এ গন্ধ কোথা থেকে আসছে? ....বন্ধুর মুখ শুকিয়ে উঠল, তিনি চাপা অথচ কম্পিতকণ্ঠে বললেন, 'চলুন চলে যাই—এসব ব্যাপার ভাল না—'

ভয় যে আমারও একেবারে হচ্ছিল না তা নয়—কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে অদূরে বিদ্যুতালোকিত কোলাহল-মুখরিত শহরের দিকে চেয়ে মনে বল আনলাম। পাশেই অমিয়বাবুদের বাড়ী, লোকজন ঘোরাফেরা করছে। তাছাড়া আমরা দুজনে আছি, এত ভয়ই বা কি। আমি বন্ধুর হাতটা চেপে ধরে আর একটু থেকে যাবার ইঙ্গিত করলাম।...

আর মিনিট তিন চার, তারপর আমরা দুজনেই শুনতে পেলাম একটা চাপা অথচ তীব্র আর্তনাদ। না—নারীকণ্ঠের নয়, পুরুষ কণ্ঠেরই। মুহূর্ত্তখানেক —তারপরই সব চুপ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন নিমেষে মিশিয়ে গেল সে ফুল আর ধূপের গন্ধ। তার জায়গায় রৌদ্রদগ্ধ মাটি ও শুকনো আমপাতার গন্ধ।...আর সেটা ভাল ক'রে

বোঝবার আগেই অকস্মাৎ একটা দমকা বাতাস উঠল—সর সর ক'রে আওয়াজ উঠল স্খলিত শুক্‌নো আমপাতার রাশির মধ্যে, টুপটাপ করে ঝরে পড়ল পাকা আম দু-চারটে—

আমার বন্ধু আর ইতস্তত করলেন না। আমার হাত ধরে প্রাণ-পণে টানতে টানতে দৌড় দিলেন। একেবারে অমিয়বাবুর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়ে শুধু বললেন, 'জল, একটু জল!' গরমের দিনে বাগানে বসবার জন্যে বিকেলে এই চেয়ারগুলো নিয়মিত পাতা হয় ভাগ্যে—আমারও আর দাঁড়াবার মত অবস্থা ছিল না।

পরের দিন সন্ধ্যা না পড়তে পড়তে পূজারীর বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। তিনি সব শুনে হাসলেন একটু। তারপর কাহিনীটা বললেন। এ ঘটনা ঘটে আঠারশ' সাতান্ন সালে, তিনি তখন বালক মাত্র। তাঁর কিছু মনে নেই। এটা পরবর্তী কালে তিনি শোনেন তাঁর মার কাছ থেকে। সত্য মিথ্যা তিনি কিছু জানেন না তবে খানিকটা যে সত্য তার প্রমাণ ত আমরাই পেয়ে এসেছি।

কাহিনীটা এই:

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ ও তেলেঙ্গী সিপাইরা যখন এসে ঐ পাহাড়ের কোলে ছাউনি ফেলে তখন এখানে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। ধান-চাল-খাদ্য-খাবার ত কারুর রাখবার যো ছিলই না—মান ইজ্জৎ প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠল। যাদের পয়সা ছিল বা পালাবার জায়গা ছিল তারা সবাই গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিলে, কিন্তু যারা উপায়হীন তারা এখানেই থেকে আতঙ্কে প্রহর গুনতে লাগল। প্রতিদিনই একটা না একটা অত্যাচারের কাহিনী কানে আসে—অথচ তার কোন প্রতিকার নেই। প্রতিকার

বা প্রতিবাদ করবে এমন সাহস কার? ইংরেজরা তখন ক্ষেপে উঠেছে এদেশের প্রতিটি লোকের ওপর তাদের বিজাতীয় আক্রোশ জেগেছে তখন!

সবচেয়ে বিপদ হল এই পূজারী-পল্লীর। প্রতিটি পরিবারেই সেবার পালা পড়ে ঘুরে-ঘুরে। দেবীর নিত্য-সেবা বন্ধ রেখে পালাবে কে? তবে তাঁরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেন, সন্ধ্যের আগেই মন্দির বন্ধ ক'রে এসে ঘরে ঢুকতেন যে-যার—তারপর কোন কারণেই আর বেরোতেন না।

এরই মধ্যে এক ঘটনা ঘটল। তাঁদের এই পূজারীবংশের একটি মেয়ের এখানেই বিয়ে হয়েছিল। তার শ্বশুর বাড়ীর কাছেই পড়েছিল ছাউনি। অত কাছে আর কেউই থাকতে সাহস করেনি, সকলেই প্রায় অন্য কোথাও না কোথাও আশ্রয় নিয়েছিল। কেবল কোন উপায় ছিল না মালতীর। তার বৃদ্ধ শ্বশুর একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে শুদ্ধ কোথায় কে আশ্রয় দেবে? তাছাড়া তার মাথাতেও কেমন একটু গোলমাল হয়েছিল, বাড়ী থেকে নড়াতে গেলে তিনি কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে অনর্থ করতেন। সুতরাং মালতীর যাওয়া হয় নি।

তবু তারা খুব সাবধানেই ছিল বৈ কি! মালতী দিবালোকে বাড়ীর উঠানে পর্যন্ত বার হ'ত না। তাকে ঘরের মধ্যে স্নানের জল ও পাকের যোগাড় পৌঁছে দিত তার স্বামী। মালতী এদেশের হিসেবে রীতিমত সুশ্রী ছিল, সেইজন্য আরও এত সতর্কতা।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনিই বিড়ম্বনা একদিন মালতীকে একাই বেরোতে হ'ল শুধু উঠোনে নয়, একেবারে রাস্তায়। ওর স্বামী মাঠ থেকে ফিরে জল খেতে গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ঘরে আর কোন

মালতী সেদিন কোথা গিয়েছিল অত রাত্রে, ডাক্তারের খোঁজে গিয়ে থাকলে ডাক্তার আনলে না কেন—একথা তার স্বামী ও শ্বশুর দুজনেই বার বার প্রশ্ন করেছেন কিন্তু মালতী ভয়ে তাদের কাছে সত্য কথাটা বলেনি। এটা সহজাত ভয়—কি দরকার খুন-খারাপির ব্যাপারে নিজেকে জড়ানোর। বিশেষত ইস্‌মাইলের রহস্য-জনক হত্যার কথাটা তখন চারিদিকেই আলোড়িত হচ্ছে। মালতী একেবারে ও কথাটা মুখেই আনলে না।

এক বছর ঘুরে গেল আবার এল বৈশাখী পূর্ণিমা। মালতী আর স্থির থাকতে পারল না। ইস্‌লাইলের সমাধি কোথায় দেওয়া হয়েছিল তা সে লক্ষ্য করেছিল, কতদিন গোপনে গিয়ে ফুল দিয়েও এসেছে সেখানে। সেদিন রাত্রে স্বামীকে পূজো দেবার ছুতোয় দূরে শিবের মন্দিরে পাঠিয়ে একা ফুল, চন্দন, ধুনো নিয়ে গিয়েছিল ঐ সমাধিটিতে পূজো করতে বা স্মরণ করতে। ফুল দিয়ে সমাধি সাজিয়ে ধূপধুনো দিয়ে আলো জ্বেলে যেমন ফিরবে, দেখা হয়ে গেল ওর এক দূর সম্পর্কে নন্দাইয়ের সঙ্গে। তিনি নির্জন গোরস্তানে একা স্ত্রীলোককে ঢুকতে দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে পিছু পিছু এসেছিলেন—সবই লক্ষ্য করেছেন।

এর ফল যা হবার তা হ'ল। কথাটা জ্ঞাতি-মহলে ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমানের সমাধিতে ফুল আলো দিয়ে যে পূজো করে, সে নিশ্চয় মুসলমানী—তার আর জাত কি থাকতে পারে? ঘোঁট হ'তে হ'তে ঠিক হ'ল যে ওকে ত্যাগ করতে হবে, আর ত্যাগ যদি না করা হয় ত তাঁরা অর্থাৎ জ্ঞাতিরা ওর স্বামী-শ্বশুরকে একঘরে করবেন। স্বামীরও একটা চাপা বিদ্বেষ এবং প্রকাশ্য সংশয় ছিল। তিনি ত্যাগ করতে রাজী হলেন!

দেখা গেল সেদিন মালতীর আশ্রয় নেবার মত স্থান এই এতবড় সহরে আর কোথাও নেই—এক বেশ্যাপল্লী ছাড়া। সে ওদের বাগানে একা কুটির বেঁধে থাকতে চাইলে, স্বামী সে অনুমতিও দিলেন না। অগত্যা যা স্বাভাবিক মালতী তাই করল। দূর থেকে তাদের বংশের ইষ্টদেবীকে প্রণাম জানিয়ে মহানদীতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেই থেকে আজও প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমার ঠিক দ্বিতীয় প্রহরের মুখে ঐখানে ফুল, চন্দন ও ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। আর শোনা যায় আহতের একটা চাপা আর্তনাদ। আর এক[illegible] ক'রে মাকড়শা চিরকাল ধরে শহীদের সমাধির উপর ঐ লূতাতন্তুর চন্দ্রাতপ রচনা ক'রে রাখে—কখনও এর ব্যতিক্রম হয় না।

ক্ষতি

প্রথম থেকেই ওর ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছিল। আমি হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে বাস্-এ চড়বার পর তিনবার না চারবার ও টিকিট চেয়ে গেল কিন্তু একবারও—আমরা যে দিকে বসেছিলুম, সে দিকে অর্থাৎ পিছনের দিকে কারুর কাছে টিকিট চাইলে না। সোজা এগিয়ে যায় সেই মাথার দিকে—ওখানেই চারটে সীটের আটজন লোকের কাছে টিকিট চায়—আবার ফিরে আসে। কোন দিকে তাকায় না—দৃক্‌পাত করে না! ফলে একেবারে সামনের সীটের এক বুড়ো ভদ্রলোক ত একবার রেগেই উঠলেন, 'কতবার টিকিট চাইবে, সেই থেকে ত বার পঁচিশেক হ'ল। একই লোক বসে আছে সেটা কি এখনও মনে পড়ছে না—এতবার দেখেও!'

কণ্ডাক্‌টরটিও বিড় বিড় ক'রে কি বকতে বকতে চলে গেল। সেটা ক্ষমা প্রার্থনা, অথবা বিরক্তি প্রকাশ তা বোঝা গেল না।

এরপরই উঠল চেকার—অর্থাৎ জগুবাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে। তখনও দেখা গেল যে আমাদের পিছনে এক রো আর সামনের তিন চার রো—কারুর টিকিট নেওয়া হয়নি। কেউ আসছে কলেজ ষ্ট্রীট থেকে, কেউ বা বৌবাজার থেকে! খান দু-তিন তিন-আনার টিকিট চাইতেই ইন্‌স্পেকটার বা চেকার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, 'এতক্ষণ কি করছিলেন মশাই, এতগুলো তিন আনার টিকিট। কি বললেন, আপনার চৌদ্দ পয়সা! বলিহারী।'

এসব ক্ষেত্রে সব কণ্ডাক্‌টর্‌ই সাফাই গায়, 'আমি ত চেয়ে চেয়ে গেছি ওঁরা না দিলে কি করব।' কিন্তু এ লোকটি সে দিক দিয়েই গেল না। মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল চেকারের মুখের দিকে।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, আমি যে আধুলি দিয়েছিলুম তার ফেরৎ পেলুম, তের আনা। আট আনা ফিরিয়ে দিয়ে বললুম, 'আমি ত আধুলি দিয়েছিলুম!'

'ও মাপ করবেন। টাকা উনি দিয়েছিলেন'—বলে আমার পাশের ভদ্রলোকের হাতে তের আনা গুঁজে দিলে লোকটি।

'সে কি কথা! আমারও যে আধুলি, আর সে আধুলি ত' আমার হাতেই এখনও মুঠো করা রয়েছে, আপনাকে ত' এখনও দিই নি!'

'কি হয়েছে আপনার বলুন ত!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন ইনস্পেক্‌টার ভদ্রলোক।

তার কোন উত্তর দেবার আগেই—এইমাত্র পাওয়া আধুলিটা ঠকাস্ ক'রে কোথায় পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে খুঁজতে গিয়ে চামড়ার ব্যাগটা থেকে আরও কতকগুলি রেজগি গেল পড়ে—ঝন্ ঝন্ ক'রে। ইন্‌স্পেকটার ভদ্রলোক এবং অন্য দুচারজন যাত্রী—সাহায্য ক'রে যতগুলো পারলেন খুঁজে দিলেন। কিন্তু ক্যাশ যদি বা উদ্ধার হ'ল, দাঁড়িয়ে উঠে টিকিট দিতে গিয়ে দেখা গেল ছ পয়সার টিকিটের বাণ্ডিলটা কোথায় উধাও হয়েছে।

এতক্ষণে ওর মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলুম। অল্প বয়সী তরুণ ছেলে, একহারা চেহারা, অথচ ঠিক রোগা নয়—বরং ওরই মধ্যে একটু বলিষ্ঠ দেখায় যেন। মোটের উপর সুশ্রী বলতেও বাধত না যদি না মুখখানা তিন চারদিনের দাড়ি-গোঁপে কণ্টকাকীর্ণ হয়ে থাকত। তাছাড়া চোখের কোলে সুগভীর কালি, প্রায় রক্তবর্ণ চক্ষু, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল—সব মিলিয়ে ওকে রীতিমত অসুস্থই দেখাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টি শুধু মূঢ় নয়—কতকটা উদ্‌ভ্রান্তও বটে।

আমার পাশের ভদ্রলোকও বোধ হয় এটা লক্ষ্য করেছিলেন—

তিনি অর্দ্ধস্বগতোক্তির মত বললেন, 'ওঁর বোধ হয় শরীরটাও ভাল নেই।'

কণ্ডাক্‌টার্‌ যেন চমকে চাইল তাঁর দিকে, নিমেষের জন্য তার মূঢ় দৃষ্টিতে দীপ্তি ফিরে এল—মনে হ'ল আঁধারে কূল দেখতে পেলে সে।

সে একবার অসহায়ভাবে ইন্‌স্পেকটরের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'সত্যিই শরীরটা বড় খারাপ লাগছে!'

'সিক রিপোর্ট ক'রে চলে যান নি কেন?' ইন্‌স্পেকটার জবাব দিলেন।

দেশপ্রিয় পার্কে এসে থামতেই আমি বাস থেকে নেমে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই কণ্ডাক্‌টারটিও নেমে এল। প্রথমটা ভেবেছিলুম টাইম নিতে নেমেছে কিন্তু গুমটির কাছাকাছি যেতেই কানে এল, 'দেখুন রায় বাবু, শরীরটা বড়ই খারাপ লাগছে আমাকে রিলিফ দেবেন?'

'বেশ ত, ক্যাশ গুণে দিয়ে ব্যাগ জমা রেখে চলে যান। কিসে যাবেন, এই বাসেই যাবেন ত? না আট নম্বরে? আপনি যাদবপুর থাকেন না?'

'না, আমি শ্যামবাজারের বাসে উঠব—আজকাল ঐ দিকেই থাকি।'

কৌতূহল প্রবল হ'ল। গল্প লেখকের কৌতূহল। আমি পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে একমত হইনি। আমি বেশ বুঝেছিলুম—খারাপ হয়েছে শরীর নয়, মন। একশ' চার জ্বর নিয়েও ডিউটি দিতে দেখেছি কিন্তু তাতে এত অন্যমনস্কতা দেখিনি কখনও। এ রকম উদ্‌ভ্রান্ত ও মূঢ় দৃষ্টি ত নয়ই।

বেশ বুঝতে পারলুম কোন একটা বড় রকমের মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু এতটা উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলার মত কী ঘটতে পারে?

অপেক্ষা করলুম একটু। এমন কোন কাজও ছিল না হাতে। বাড়ী ফেরা ত, যখন হোক, ফিরলেই হবে। আর এই তো মোটে আটটা।

ছোকরা ক্যাশ আর টিকেট জমা দিয়ে সরে এসে ফুটপাথে দাঁড়াল খানিকটা—ওপারে যাবার কোন চেষ্টাই করল না। আশান্বিত হয়ে উঠলুম, অর্থাৎ এখনই শ্যামবাজারের বাস ধরবে না।

তেমনিই মূঢ় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রাসবিহারী এভিন্যুর জনস্রোতের দিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে থেকে একসময় যেন চমকে উঠল, হয়ত মনে পড়ল গুম্‌টির রায়বাবুর কথা।

যদি দেখতে পান তো কী মনে করবেন ভদ্রলোক! তাড়াতাড়ি খানিকটা পূর্বমুখে এগিয়ে গিয়ে পার্কের গেটটার সামনে আর একবার থমকে দাঁড়াল। কোথায় যাবে মন স্থির করতে পারছে না—বাড়ী যাবার ইচ্ছা আদৌ প্রবল নয়। আমার অনুমানই সমর্থিত হ'ল—ব্যাধি শরীরে নয়, মনে। দেহ অসুস্থ হ'লে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না।

খানিকটা অমনি দাঁড়িয়ে থাকবার পর একটু ইতস্তত ক'রে সে পার্কেই ঢুকে পড়ল। ভেতরে গিয়ে ক্লান্তভাবে পা টেনে টেনে একটু ঘুরল—সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীনভাবে, তারপর অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও নির্জন কোণ বেছে নিয়ে ঘাসের ওপরই এলিয়ে শুয়ে পড়ল, আকাশের দিকে চেয়ে।

আমি দূর থেকে এতক্ষণ ওর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। এইবার সুযোগ পেয়ে কাছে গিয়ে ঠিক ওর পাশটিতে বসে পড়লাম। ও

চমকে উঠল, একটু বোধ হয় বিরক্তও হ'ল এই ঘনিষ্ঠতায়।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'দেখুন, আমি ঐ বাসে ছিলুম।'

'কো-কোন্ বাসে?' কেমন যেন ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে।

'এইমাত্র যে বাস থেকে এলেন। আমিও ছিলুম, প্যাসেঞ্জার একজন। আমাকেই আপনি আধুলি নিয়ে টাকার রেজগি দিয়েছিলেন!'

'ও!' নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর এল। সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে এটাও ছিল যে, বেশ ত, বাস ত ছেড়েছি, আর কেন? সরে পড়ো দিকি বাপু।

'আচ্ছা কি হয়েছে আপনার বলুনত ঠিক ক'রে।'

'শরীরটা খারাপ লাগছে।' বিরক্ত, ঈষৎ যেন রুষ্টও শোনাল কণ্ঠস্বর।

'তা ত আপনি ওখানেও বললেন। কিন্তু তাই কি ঠিক? সে রকম অসুখ করলে বাড়ীই চলে যেতেন। অত দাঁড়িয়ে ভাবতেন না। আমার বিশ্বাস মনের মধ্যেই আপনার একটা কি প্রলয় কাণ্ড ঘটেছে—ঠিক কিনা বলুন?'

'কী হবে আপনাকে ব'লে? কে আপনি? আপনাকে ত আমি চিনি না!'

বেশ একটু রূঢ় হয়ে ওঠে। রাস্তার উজ্জ্বল আলোর আভায় আমাকে ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করে।

'বলাটা আপনারই প্রয়োজন, যতক্ষণ না বলতে পারছেন ততক্ষণ আপনার শান্তি নেই। আর সে রকম বলবার মত লোকও আপনার নেই তা বুঝতে পারছি, নইলে আপনি সেখানে না গিয়ে মাঠে এসে শুয়ে পড়তেন না। বাড়ীও ছেড়েছেন মনে হচ্ছে—থাকতেন

যাদবপুর—চলে গেছেন শ্যামবাজারে। আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে বলুন দিকি!'

'আপনি কি গোয়েন্দা?' কেমন যেন ভয়ে ভয়ে উঠে বসে সে।

'না, গোয়েন্দা নই সাহিত্যিক। তাদের কৌতূহল পরের তাগিদে—আমার কৌতূহল সাহিত্যের তাগিদে। তফাৎ এই!'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, 'ঠিক বলছেন? শুধুই কৌতূহল? অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই?'

'ঠিক বলছি, দরকার হয়ত দিব্যি গেলে বলতে পারি।'

'তাহলে শু'নুন। আপনাকেই বলব সব খুলে। কাউকে বলতে না পারলে আমার আর চলছে না, সত্যিই।'

একটু একটু ক'রে খাপছাড়া এলোমেলো ভাবে বেরিয়ে এল সমস্ত বিবরণ। তার মধ্যে যে ঠিক পারম্পর্যও রইল না, তা বলাই বাহুল্য। বহু কথা জিজ্ঞাসা ক'রে, জেরা ক'রে জানতে হ'ল। কাহিনী যখন শেষ হ'ল তখন যা দাঁড়াল তা হচ্ছে এই:

ছেলেটির নাম অশোক। বাড়ী ওদের পূর্ব বঙ্গে। সংসারের অবস্থা খুব ভালো না হ'লেও পড়াশুনো করত, বাঙ্গলা যখন ভাগ হ'ল তখন সবে ইণ্টারমিডিয়েট পাস ক'রে সে বি-এস-সি তে ভর্তি হয়েছে। তারপর আর পড়াশুনো সম্ভব হয়নি। ওদের গ্রামে ঠিক কিছু হয়নি কিন্তু তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে টিকতে পারবে না ওরা—তা আগেই অনুমান করেছিল। শহর ছেড়ে পড়াশুনো ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বসতে হ'ল। কারণ প্রতিদিনই আতঙ্ক, প্রতিদিনই নতুন গুজব। বাড়ীর ছেলেরা বাড়ীতে না থাকলে মেয়েরা থাকে কি ক'রে? বৌদি ছিলেন, বয়স্কা বোন ছিল—মা কাকী পিসি ত ছিলই। দাদা রঙ্গপুরে চাকরী

করতেন, তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়, বাবা বুড়ো মানুষ সুতরাং অশোক আর তার ছোট ভাইকেই দেশে গিয়ে বসতে হ'ল।

তারপর ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারীতে এমন কাণ্ড শুরু হ'ল চারদিকে, যে আর দেশে থাকা সম্ভব হ'ল না। শোনা গেল যে এর পর আর আসাই যাবে না। পড়ে রইল জমি-জমা গরু বাছুর, ঘরের টিন-গুলো পর্যন্ত বিক্রী ক'রে আসা গেল না। তবে ওর বাবার বন্ধু হবিব মিয়ার ছেলে আতোয়ার দয়া ক'রে এসে সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাওয়াতে সামান্য কিছু গহনাপত্র টাকা-কড়ি নিয়ে আসা গিয়েছিল। ওরা আশা করেছিল পরিবারবর্গ নিরাপদে কলকাতায় এসে পৌঁচেছে জানলে দাদা আর চাকরীটা ছাড়বে না! কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে যে কয়দিন থাকতে হয়েছিল তারই মধ্যে দাদাও এসে জুট্‌লেন, চাকরী ছেড়ে দিয়ে।

এর পরের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দুর্দশার দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে যা দাঁড়াল তা হচ্ছে এই যে ওরা যাদবপুরের কাছাকাছি একটু জমিতে ছিটে-বাঁশের দুখানা ঘর তুলে নিয়েছে এবং দাদা অন্য কোথাও কোন কাজ জোটাতে না পেরে এক বাজারে ফলের দোকান দিয়েছেন। ওদের পড়াশুনার কথা ওঠেই না—কারণ সামান্য যা কিছু আনতে পেরেছিল ওরা, তা এক বছর বসে খেতে এবং ঘর তুলতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। বৌদির হাতের শেষ বালা জোড়া বেচে দাদা দোকান দিয়েছেন। যাই হোক্—অশোক এ চাকরীটা পেয়ে গিয়েছিল বছর খানেকের মধ্যেই, তাই রক্ষা, কোনমতে সংসার চলছে। ছোটভাই অরুণ—সম্প্রতি এক কারখানায় ঢুকেছে, য়্যাপ্রেন্টিস্ হিসেবে।

অর্থাৎ এইবার একটু সুখের না হোক—স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখবার কথা।

এমন সময় এসে জুটল দীপ্তি—কোথা থেকে অতর্কিতে।

মাস আষ্টেক আগের কথা। গাড়ী এসে গড়িয়াহাট ডিপোয় থেমেছে—অশোক একটা সীটে বসেই ক্যাশটা মোটামুটি একবার মিলিয়ে নিচ্ছে, হঠাৎ মুখ তুলে দেখে সামনের সীটে তখনও একটি তরুণী মেয়ে বসে আছে—বেশ সুশ্রী চেহারা, হাতে বই খাতা ;—বেশ ভূষার মধ্যে মহার্ঘতা না থাকলেও রুচির পরিচয় আছে ; এক কথায় শিক্ষিত ও সম্পন্ন ঘরের মেয়ে—ওরই দিকে স্মিত প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

হিসেব গোলমাল হয়ে গেল নিমেষে।

'আপনি নামবেন না ?' প্রশ্ন করে অশোক।

'না।' বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ—দ্বিধা কি সঙ্কোচের নাম-গন্ধ নেই। 'আমার নামার কথা দেশপ্রিয় পার্কে। আমি ল্যান্সডাউন অঞ্চলে থাকি—'

'তবে ?'

'অন্যমনস্ক হয়ে চলে এসছি। তাতে কি, আবার ফিরে যাবো।'

রাত তখন ন-টা। সামনে আরও তিন খানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। স্বভাবতই ব্যস্ত হয়ে উঠল অশোক, 'আপনি নেমে ঐ আগের গাড়ীতে গেলেন না কেন ? এটার বেরোতে অনেক দেরি হবে। অন্তত আধ ঘণ্টা।'

'থাক্ গে, আমি আর উঠতে পাচ্ছি না। একসময় যাবে ত ! অবশ্য আপনার অসুবিধা হয়ত আলাদা কথা।'

'না না—আমার অসুবিধা কি ?' লজ্জিত হয়ে অশোক হিসাবে মন দেয়। ড্রাইভার বসেছিলেন আলো নিবিয়ে দেবেন ব'লে, তিনি

একটু মুচকি হেসে ওপাশ দিয়ে নেমে গেলেন অসংখ্য চায়ের দোকানের একটিতে—আলুর দম পাউরুটি আর চা খাবেন ব'লে।

অশোক ক্যাশগুলো আবার থলিতে ও পকেটে পুরল। টিকিট-গুলো আর একবার মিলিয়ে নিলে। এই বার ওর নেমে যাবার পালা। গুমটিতে যেতে হবে। চা একটু খেয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। ক্ষিধেও পেয়েছে। শ্যামবাজারে খাবার সুবিধে হয় না। এখানেই ভাল।

সে একবার মেয়েটির দিকে চাইলে।

মেয়েটি তেমনি নির্ণিমেষ নয়নে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পাৎলা দু'টি ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য প্রসন্নতা।

ওর চোখে চোখ পড়তেই বললে, 'বসুন না একটু।'

'এটা একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসি, নইলে—'

'একটু পরেই যাবেন। এখনও ত দেরী আছে। এঁরা আলো নিভোবেন নাকি?'

'না—না। অসিতদা নেমে গেছেন। বসুন আপনি।'

তারপর মেয়েটি একে একে ছোট ছোট নানা প্রশ্ন করে। ওর নাম ধাম, সাধারণত কখন ডিউটি পড়ে, আসছে কাল কটা থেকে কটা—কোন লাইন। ওর নম্বর কত ইত্যাদি। খুব যে আগ্রহ আছে তা প্রশ্ন করবার ভঙ্গীতে মনে হয় না। মনে হয় সময় কাটানোর জন্য অলস প্রশ্ন এগুলো।

ওর নামধামও অশোকের জানতে ইচ্ছা হয় বৈ কি। কিন্তু সঙ্কোচে বাধে। অপরিচিতা সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণী মেয়েকে 'আপনার নাম কি' প্রশ্ন করা যায়? বিশেষত ওর মত লোকের কাছে সেটা ধৃষ্টতা।

অবশেষে আগের বাসটাও যখন ছেড়ে চলে গেল তখন হঠাৎ এক

সময় মেয়েটি বললে, 'আপনাকে যখন এত কথা জিজ্ঞাসা করলাম তখন নিজের পরিচয়ও কিছু দেওয়া দরকার—আমার নাম দীপ্তি লাহিড়ী। আমার বাবা এ্যাটর্নী।...আবার আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন ত?'

'সেটা আগে থাকতে কি ক'রে বলি বলুন। এর পরে দেখা হোক্।' মুচকি হেসে বলে অশোক।

'বা-রে, বেশ ত কথা কইতে পারেন। এতক্ষণ কেমন ভালমানুষের মত হাঁ-না জবাব দিচ্ছিলেন!'

'আপনাদের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলাও যে আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। আমরা সামান্য কণ্ডাক্টার বই ত নই। প্যাসেঞ্জারের কাছে আমরা মানুষের চেয়ে ছোট কোন জীব।'

দীপ্তি উত্তেজিত ভাবে কি একটা প্রতিবাদ করতে গেল কিন্তু সেই সময়ই দু'টি মহিলা এসে উঠলেন। ওদিকে ড্রাইভার অসিতবাবু এলেন গাড়ী খানাকে এগিয়ে নেবার জন্য। অশোককেও নেমে যেতে হল টাইমবাবুর কাছে। আর কোন কথাই হ'ল না।

অশোক মনে মনে চটেই গেল মেয়েটির ওপর—কী দরকার ছিল এমন ভাবে বসে থাকার! মাঝখান থেকে ওর চা খাওয়াই হ'ল না। পেটে যেন কুকুর কামড়াচ্ছে—এত ক্ষিধে।

দেখতে দেখতে বাস ভরে উঠল। আর কথা কওয়ার সময় হ'ল না। একেবারে ল্যান্সডাউনের মোড়ে নেমে যাওয়ার সময় শুধু মেয়েটি একবার ওর চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে খুব মিষ্টি হেসে গেল।

সেদিন রাত্রে কি দীপ্তির কথা ওর খুব মনে পড়ছিল? খুব মনে হয়নি নিশ্চয়ই। সে অবসর কোথায়? রাত বারটার পর বাড়ী ফিরে

গিয়ে শুতে শুতে একটা হয়েছে। তখন শারীরিক ক্লান্তিতে সমস্ত স্নায়ু আপনিই অবশ হয়ে এসেছে—একবার হয়ত মনে হয়েছিল মিষ্টি একখানা মুখ, পাৎলা লাল দু'টি ঠোঁটে ঈষৎ একটু হাসির ভঙ্গী। রাগও হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে—অশোকদের জীবন নিয়ে এসব অলস কৌতূহল ঐ ধনী দুলালীদের কেন?

পরের দিন সকালে উঠেও সহস্র সাংসারিক কাজের মধ্যে একবার মনে পড়েছিল কিংবা পড়েনি। বাসের পাটাতনে পা দিলে ত পৃথিবীটাই ভুলে যেতে হয়—তা সুশ্রী তরুণী মেয়ে!

কিন্তু হঠাৎ ও চমকে উঠল রাত নটা নাগাদ যখন ওর বাস থেকে গড়িয়াহাটের গোল পার্কের কাছে একটি ছাড়া সব যাত্রী নেমে গেল —তখন সেই একটির দিকে চেয়ে।

দীপ্তি লাহিড়ী! ঠিক ত!

কৌতুকভরা চাপাহাসি ওর ঠোঁটের কোণে, চোখের চাহনিতে।

'এ কি! আজও অন্যমনস্ক হয়ে নাকি? না এদিকেই যাবেন?' প্রশ্নে একটু খোঁচা ছিল অশোকের।

'যাক্। চিনতে পেরেছেন তাহ'লে? বাঁচলুম।'

'কিন্তু আমার কথার ত জবাব পেলাম না!' সাহস কি বেড়েই যায় অশোকের?

'হ্যাঁ—অন্যমনস্ক ত বটেই। তবে সে অন্য আপাতত আমার জানা এবং এক। স্থির ও ধ্রুব।'

কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না অশোক। অত বিদ্যাবুদ্ধি ওর নেই, কলেজে পড়ার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে। দু'চার খানা সাহিত্য গ্রন্থ তখন যা পড়েছিল—এখন পড়বার সময়ও নেই, সুযোগও নেই।

সেদিন কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না—গাড়ী ছিল না আগে। 'এত তাড়াতাড়ি! কী মুস্কিল।'

হাত-ঘড়িটা তুলে দেখে নটা দশ। আপন মনেই বলে, 'এতরাত্রে আর শ্যামবাজার যাওয়া সম্ভব নয়। কাল ক'টায় ডিউটি আপনার? এই সময়েই ত?'

'কেন বলুন ত!'

চাপা গলায় দীপ্তি তর্জন করে, 'ব'লে ফেলুন না তাড়াতাড়ি—দেখছেন না লোক আসছে।'

'হ্যাঁ—আফ্‌টারনুন ডিউটি।'

'ঠিক আছে।...'

পরের দিন ওর কথাটা ভোলেনি কিন্তু অশোক। সকালেও মনে পড়েছিল বারকতক। কালও কেন এল মেয়েটি? কাকে দরকার? কার কথা বলছিল? তবে কি—? না, তা বিশ্বাস হয় না অশোকের। এটুকু সহজ বুদ্ধি আছে ওর। ঐ রকম মেয়ে—কলেজে পড়া নিশ্চয়ই, সুশ্রী, শিক্ষিতা—অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, আর সে একটা বাসের কণ্ডাক্‌টার! নিশ্চয়ই অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে সে। ওকে তরুণ পেয়ে একটুখানি কৌতুক করে শুধু, একটু নাচাতে চায়। ভাবে বোকা বোকা লোক, এতেই চরিতার্থ হয়ে যাবে। সময়ক্ষেপের প্রয়োজন শুধু তার অশোককে নিয়ে।

তবু মনে পড়ে বৈ কি।...

আসমানী রঙের শাড়ী আর লাল ব্লাউজে ওর দেহের স্বাভাবিক কান্তি যেন উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছিল, এলো খোঁপাতে ছিল দু'টি রজনীগন্ধা ফুল। নামবার সময় তার একটি পড়ে গিয়েছিল—এক ফাঁকে সযত্নে কুড়িয়ে নিয়েছিল অশোক।...

সে চুপ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে বসে আছে দেখে দীপ্তি বললে, 'কৈ আপনি হিসেব মিলোলেন না ?'

'পরে মিলোব !' সংক্ষেপে উত্তর দেয় অশোক।

'আচ্ছা, আচ্ছা। আমি নেমে যাচ্ছি।' দীপ্তি ওঠবার ভঙ্গী করে।

'না, না—বসুন না।' আকস্মিক আকুল আমন্ত্রণ বেরিয়ে আসে অশোকের কণ্ঠ থেকে—নিজের অজ্ঞাতসারেই।

'কী দরকার আপনার কাজের ক্ষতি ক'রে !' সূক্ষ্ম অভিমান ওর গলার আওয়াজে।

'না, না—কাজ সারছি আমি।'

'আচ্ছা, কালও কি আপনার ইভনিং ডিউটি ?'

'না, কাল মর্ণিং। রাত চারটেয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে হেঁটে লেকে এসে গাড়ী ধরতে হবে। পাক্কা তিন মাইল হাঁটা।'

'তারপর ? ফিরবেন কখন ?'

'বাড়ী পৌঁছতে আড়াইটে তিনটে। তাও যদি একটু দেরি হয়ে যায়, ফার্স্ট কার না পাইত আরও দেরী।'

'যাক্‌গে—তাহ'লে বিকেলে ত' ছুটি আছে। কাল সন্ধ্যেয় ছ'টার সময় দেশপ্রিয় পার্কের গেটের কাছে আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। ঠিক আসবেন কিন্তু !'

বিস্মিত অশোক প্রশ্ন-প্রতিবাদ মিলিয়ে কী একটা বলতে গেল, দীপ্তি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, নেমে যাবার সময় বলে গেল, 'দুজনে একটু বেড়াতে যাবো। তাতে আর ক্ষতি কি ? সে ত আপনার কাজের সময়ের বাইরে।'

উত্তর বা প্রতিবাদের অপেক্ষা না ক'রে এগিয়ে গিয়ে সামনের বাসে উঠল।

না গিয়ে পারল না অশোক। আমোঘ, অপ্রতিহত আকর্ষণ, নানা প্রশ্ন জাগে মনে—দীপ্তির এ খেয়ালের অর্থ কি? কি খেলা খেল্‌তে চায় সে ওকে নিয়ে? সংশয় ও উদ্বেগে ওর মন কণ্টকিত হয়ে যায়—তবু নিজেকে সে খেলার বাইরে রাখতে পারে না—পারে না সাবধান হ'তে!

ঠিক ছটায় পৌঁছেও দেখলে দীপ্তি দাঁড়িয়ে আছে। দীপ্তি একটা ট্যাক্সি ডাকতে যাচ্ছিল, অশোক বেঁকে দাঁড়াল। বেড়াতে যেতে হয়ত সে তার সাধ্য-মত যানবাহনেই যাবে। ট্যাক্সি ভাড়া দিতেও পারবে না—দীপ্তিকেও দিতে দেবে না।

অগত্যা দীপ্তি ট্রামে চড়ে। বসে পাশাপাশি। যৌবন-তপ্ত দেহের সামান্য স্পর্শ পায় অশোক। সে স্পর্শ স্যাম্পেনের নেশার মত মাথায় চড়ে একটু একটু করে। কথার ফাঁকে যেন অন্যমনস্ক ভাবেই আতপ্ত কোমল হাত একখানা বার বার এসে পড়ে ওর হাতের মধ্যে। অশোক এক সময় চরম সাহসে ভর ক'রে সে হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে। ফিরিয়ে নেয় না দীপ্তি। তবু অশোকের নিজের লজ্জা করে। সামান্য ধুতি ও সার্ট—নিজের যা বেশ ভূষা! তার পাশে দীপ্তির সাদা জর্জেটের শাড়ী নিতান্তই বেমানান!

গঙ্গার ধারে দোতলার ভাসন্ত রেঁস্তোরায় গিয়ে বসে দুজনে—সামনা সামনি। ওদের পাশেই গঙ্গা—এই হোটেলের আলো তার জলে নাচছে। দূরে বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে—তাদের বিজলী আলোর পাশাপাশি অসংখ্য ডিঙ্গি নৌকোর হ্যারিকেন থেকে আলো এসে পড়ছে ওদের আলোর পাশে। হু-হু করে হাওয়া বইছে, সজল মিষ্টি হাওয়া। তাতে দীপ্তির চুল উড়ছে—উড়ছে অশোকের ললাটের চুল। দৃষ্টি হয়ে এসেছে মদির। খাবার সামনে পড়ে ঠাণ্ডা হয়, চা জল হয়ে

যায়—ওরা তাকিয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। লজ্জিত ও সচেতন হয়ে চোখ সরিয়ে নেয়—লম্বা বারান্দার অন্য অধিবাসীদের ওপর থেকে দৃষ্টিহীন সে চোখ ফিরে এসে আবার পরস্পরের সঙ্গে মেলে। একটু ক্ষীণ হাসি হাসে দুজনেই। অপ্রতিভের হাসি। অনেকরাত্রে দুজনেই নিঃশব্দে বাড়ী ফেরে। হঠাৎ যেন দুজনেরই কথার উৎস গেছে ফুরিয়ে।

এরপর থেকে সাক্ষাৎ ঘটে নিয়মিত। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়—নিজেদের কাজের ফাঁকে সুযোগটা মিলিয়ে নেয়। জানাজানি একটু হয়—হাসাহাসিও, কিন্তু ক্রমশ অশোকও হয়ে ওঠে বেপরোয়া। এমন কি এক একদিন ওর বাসে চেপে গড়িয়াহাট আসে দীপ্তি—আবার হয়ত ফিরে যায় শ্যামবাজার পর্যন্ত। কাজের মধ্যেই হয়ত মুহূর্তের জন্য চোখে চোখ মেলে—তা-ই লাভ!

মাস দুই আগে দীপ্তিই প্রস্তাব করলে, 'এসো আমরা বিয়ে করি।'

চমকে ওঠে অশোক। ধ্বক্ ধ্বক্ করে বুকের মধ্যে, শুক্‌নো মুখে বলে, 'পাগল নাকি! তুমি লাহিড়ি, আমি মণ্ডল। তোমার বাবা কী বলবেন?'

'রেজেষ্ট্রী ক'রে বিয়ে হবে। আমার বয়স একুশ হয়ে গেছে তা জানো? অন্তত ইউনিভার্সিটি এজ। বাবার মত না নিলেও চলবে।'

'আমার বাড়ীতে আপত্তি করবে। বাপের অমতে মেয়েকে ঘরে আনা—।'

'আমরা দুজনেই ত কূলের নোঙর ছিঁড়ে অকূলে ভাসছি। কী হবে বাড়ীর কথা ভেবে!'

'তোমাকে খাওয়াবো কি? মাইনে যা পাই তাতে ক'দিন চলবে?'

'যেমন ক'রে হোক চালাবো। আমি রান্না করবো, আমি বাসন মাজবো। তোমার জন্যে করছি মনে হ'লে কোন কাজই আমার আটকাবে না। না, তুমি হেসো না—ঠিক পারবো।'

হাসে না অশোক, গম্ভীর হয়েই যায় বরং। এ সম্ভাবনা কখনও ভাবেনি। দু'দিনের খেলা ভেবে স্রোতে গা ভাসিয়েছিল। শুধু সংযত রেখেছিল খেলাটাকে মানসিক সীমার মধ্যেই।

বলে, 'বাড়ীতে ত কিছু দিতে হবে আমাকে?'

'কেন?' তীব্রকণ্ঠে বলে দীপ্তি, 'তোমার দাদা আর ভাই দু'জনেই রোজগার করছেন। তুমি আর কত স্যাক্রিফাইস্ করবে? এবার না হয় নিজের দিকেই তাকালে। নিজের নীড় বাঁধবার দিকে মন দাও। আর নিতান্ত না চালাতে পার, আমি ত লেখাপড়া শিখেছি—বি. এ. পাশও করেছি, আমি পারব না একটা চাকরী জোটাতে?'

ইচ্ছার অগ্নিতে প্রলোভনের ঘৃতাহুতি পড়ে। প্রত্যহ একই কথা বলে দীপ্তি। ভবিষ্যতের সোনার ছবি আঁকে। দীপ্তির মত মেয়ে তাকে রেঁধে খাওয়াবে, তার সেবা করবে? সে কি সম্ভব? ঐ দুর্লভ তনুলতা তারই শয্যায় পাশে শুয়ে থাকবে? তার সামান্য শয্যায়? এ যে কল্পনাতীত সৌভাগ্য!

তবু সে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। দারিদ্র্যের ছবিকে যতটা সম্ভব বাস্তবের তুলিতে ভয়াবহ ক'রে তোলে। বোঝাবার চেষ্টা করে যে এ বিবাহে ওরা কেউ-ই সম্ভবত সুখী হতে পারবে না। কিন্তু দীপ্তি কোন কথাই শুনতে চায় না।

অবশেষে একদিন বেলা দুটোর সময় ডিপোতে রিপোর্ট করতে গিয়ে দেখে দীপ্তি দাঁড়িয়ে আছে।

সোজা কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি চিরকালের মত। ভেবে দেখলুম ঝাঁপ দিয়ে না পড়লে আর কোনদিনই তোমাকে রাজী করানো যাবে না। আজ আর ডিউটিতে গিয়ে কাজ নেই। তুমি ঘর খোঁজগে। সন্ধ্যের মধ্যে ঘরকন্না পাততে হবে। যাও, যাও—আর দাঁড়িও না।'

নিমেষে ঘেমে ওঠে অশোক, 'কিন্তু বিয়ে—'

'সে ত নোটিস না কি দিতে হয়। সে কাল দুপুরে গিয়ে জেনে নেবো খন্। তুমি দু'দিন ছুটি নেবে। এখন আগে ত ঘর খুঁজে বের করো গে। পথে পথে কতক্ষণ ঘুরব?'

তবু অশোক ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কী পাগলামি করছ দীপ্তি, ঘরে ফিরে যাও। এভাবে হবে না। সবটাই খেয়াল নয়। তাছাড়া ঘর কোথায় পাব এত তাড়াতাড়ি? পয়সা কড়িও তেমন হাতে নেই।'

দীপ্তি ব্যাগ খুলে চল্লিশটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'এই টাকাটা হাতে ছিল, নিয়ে এসেছি। আপাততঃ একটা ঘর দেখোগে। চিঠি লিখে রেখে ঘর থেকে বেরিয়েছি, সে চিঠি এতক্ষণে ওঁরা হয়ত পেয়েছেন। আর ফেরা যায় না। এখন যদি তুমি গ্রহণ না করো আমাকে ত, আজই আত্মহত্যা করতে হবে।'

এরপর তরুণ ছেলে আর কি করতে পারে?

সারাদিন ঘুরে শোভাবাজারের দিকে এক বস্তিতে একখানা ঘর পাওয়া গেল। মেঝে দেওয়াল পাকা, খোলার চাল। তাই বারো টাকা ভাড়া—দু'মাসের ভাড়া অগ্রিম।

সামান্য বিছানা, দু একটা ঘরকন্নার সামান্য তৈজসপত্র—দীপ্তির জন্য একসেট সাড়ী সায়া ইত্যাদি কিনে রেখে যখন দীপ্তির খোঁজে গঙ্গার ধারে এল তখন রাত আটটা বেজে গেছে।

অশোক বললে, 'এখনও ভেবে ছাখো দীপ্তি।'

ওর হাত ধরে ওর ওপরই নিজের ভার যেন এলিয়ে দিয়ে দীপ্তি বললে, 'অনেক ভেবেছি, আর নয়। আজ থেকে তুমি ভাববে! চলো, আমাদের বাড়ী যাই।'

অত্যন্ত সংকীর্ণ অন্ধকার গলি পেরিয়ে সেই স্যাঁৎসেঁতে দুর্গন্ধময় বস্তির মধ্যে পড়ে অবশেষে যখন ওদের ঘরের তালা খুলে অশোক বললে, 'এসো' তখন কিন্তু দীপ্তি থমকে দাঁড়িয়েই রইল কিছুক্ষণ। এই প্রথম সে বাস্তবের সামনে দাঁড়াল—মুখোমুখি।

ঘরে হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে রেখেই বেরিয়েছিল অশোক। সস্তা দামের দেশী হ্যারিকেন; তার একদিকের পল্‌তেতে কালি পড়ে ইতিমধ্যেই মলিন আলো মলিনতর হয়ে এসেছে—কেরোসিনের গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ। তারই ক্ষীণ আলোতে দেখা গেল ঘরের অপর্যাপ্ত আসবাব। দু একটা য়্যালুমিনিয়ম আর এনামেলের বাসন, আম-কাঠের চৌকিতে একটা পাৎলা বিছানা, জলের বাল্‌তি, মগ—বিছানার ওপরই সাড়ী সায়াগুলো পড়ে আছে।

'কৈ, এসো। ভয় পাচ্ছে নাকি?'

দীপ্তি এসে ক্লান্তভাবে বিছানাটায় বসে পড়ে বলে, 'এই ঘর তুমি খুঁজে বার করলে! পাকা বাড়ীতে ঘর পেলে না?'

'সে কি আজকালকার দিনে অত সহজ! চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা ঘরের ভাড়া, সেলামী য়্যাডভান্স! তাও জামিন চায়। অপরিচিত

লোককে কেউ ভরসা ক'রে এক কথায় বাড়ী ভাড়া দেয়? এই তাই দু-মাসের ভাড়া আগাম দিতে হয়েছে। তোমার চল্লিশ ছাড়া আরও চল্লিশ ধার করেছিলুম, সব খতম।'

খানিকটা স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে দীপ্তি আবারও প্রশ্ন করলে, 'বাথরুম নেই বোধ হয়?'

'বাথরুম! বস্তিতে! কলই নেই। রাস্তায় কল থেকে ঝিকে দিয়ে জল আনাতে হবে, এই ভিতরের রকে বসে কাজ সেরো। ঝি যত দিন না পাই—আমিই জল তুলে দেব।'

কাঠ হয়ে যায় যেন দীপ্তি। ভেতরের দিকে অসংখ্য আরও ঘর—তাতে অগণিত ভাড়াটে। রান্নার গন্ধে ধোঁয়ায় ও নানাবিধ দুর্গন্ধে বাতাস যেন ভারী। কোলাহলও কম নয়। একটু পরে বলে, তুমি কাল পরশুর মধ্যে একটা ভদ্র বাড়ীতে ঘর দেখে নাও। হারটা ত' আছে গলায়, বিক্রী ক'রে য়্যাড্‌ভান্স দেব। খাই না খাই—থাকাটার জন্য ভদ্র পরিবেশ দরকার।'

'কিন্তু সে যে অনেক টাকা দীপু। তারপর খরচ জোগাবো কোথা থেকে?'

'সে আমিই ব্যবস্থা ক'রে নেবো।'

'আচ্ছা সে হবে। এখন ঐ বালতিতে জল আছে, তাকে সাবান স্নো সব আছে। তুমি একটু সুস্থ হও—আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি। এখন ত আর রান্না সম্ভব নয়।'

সেদিন রাত্রে দুজনে পাশাপাশিই শুল। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা কেউ-ই করলে না। বিয়ে এখনও হয়নি ব'লে অশোকের সঙ্কোচ। আর দীপ্তি? সে বোধ হয় ঠিক এ স্বপ্ন দেখেনি। তার মন অসাড় হয়ে এসেছে ততক্ষণে। ধনীর মেয়ে, খেয়াল হওয়া

মাত্র মেটাতে সে অভ্যস্ত—অশোককে পাবার খেয়ালে বাধা পড়াতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েছিল কিন্তু তাই ব'লে—! সব ব্যাপারেরই একটা সীমা থাকা দরকার।

পরের দিনও রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হ'ল না। সারা সকাল ঘর খুঁজে বেড়াল অশোক। দু-তিনটা সন্ধান পাওয়া গেল এই মাত্র। একটায় ডিউটি—অশোক বললে, 'মিছি মিছি কামাই ক'রে লাভ কি? এখানে যখন ঘরকন্না পাতবেই না তখন ভাল ঘর পেলেই ছুটি নেব। বিয়ে-থার ব্যাপারও আছে—তখন ছুটি নেওয়াই ভাল।

সে ডিউটিতে চলে গেল।

দীপ্তি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সেই নিরানন্দ বুকচাপা ঘরে একা। এতক্ষণে বাড়ী থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই। তাই রাস্তায় বেরুতে ভরসা হল না।

খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছিল ঠিকই। যার টাকা আছে তার এসব ক্ষেত্রে কিছু সুবিধাও আছে। খুঁজতে খুঁজতে বাসের গুমটিতে এসে খবর মিলল—মেয়েটির সঙ্গে বর্ণনাতেও মিলে গেল। অশোক মণ্ডল! মিঃ লাহিড়ি ছুটে গেলেন ওদের বাড়ীতে—শুনলেন সেখানেও সে অনুপস্থিত, সেদিন ডিউটিতে আসেনি। দুই আর দুইয়ে যে চার হয়, সে বিষয়ে মিঃ লাহিড়ি নিঃসন্দেহ হলেন।

কিন্তু গেল কোথায়? পুলিশই পরামর্শ দিলে চুপ ক'রে থাকতে। ডিউটিতে এলেই জানা যাবে। ডিউটি শেষ হ'লে পিছু নেওয়া কিছু শক্ত নয়। মিঃ লাহিড়ি কথাটা বুঝলেন।

গভীর রাত্রে অশোক এসে দোরে ধাক্কা দিতে দীপ্তি নিঃশব্দে

এসে দোর খুলে দিলে। অভ্যর্থনার একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোল না। হ্যারিকেনটা সকালে মোছা হয় নি, দীপ্তি জানেও না মুছতে। পাশের ঘরের কাকে ডেকে শুধু জ্বালিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু কালিতে কালিতে এখন সে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। তবু তারই ক্ষীণ আলোতে অশোক বুঝতে পারলো দীপ্তি বহুক্ষণ ধরেই কাঁদছিল। সমস্ত মনটা তারও বিরক্তিতে ভরে গেল। সে একটু রূঢ় কণ্ঠেই বললে, 'এ আমি আগেই জানতুম—তাই সহজে রাজী হই নি। খেলা ত ঢের হয়েছে, এবার আর কি, ধনী-দুহিতা ঘরে ফিরে যাও। আমারই শুধু ইহকাল পরকাল মাটি হয়ে গেল, কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।'

ফলে দীপ্তির কান্না বেড়েই গেল। এই অপ্রিয় এবং অরুচি-কর নাটক কতক্ষণ চলত তা জানি না। কিন্তু ঠিক এই সময়ই মিঃ লাহিড়ি এসে প্রবেশ করলেন সদলবলে—আরও নাটকীয় ভাবে।......

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। অশোক আজও তা বলতে পারলে না ভাল ক'রে—সে নিদারুণ অপমানের কাহিনী। গলা বুজে আসতে লাগল বার বার।

দীপ্তি ছুটে এসে পড়েছিল বাবার পায়ে তা মনে আছে। বোধ হয় ক্ষমাও চেয়েছিল। বলেছিল, 'আমাকে বাঁচাও বাবা—এখানে আর একদিন থাকলে মরে যাবো আমি!'

মিঃ লাহিড়ির কটূক্তি ও অপমানকর বাক্যবাণ অনুমেয়। তিনি অশোককে ধরে হাজতে নিয়ে যাবার জন্যই জেদ করেছিলেন, শুধু সঙ্গের পুলিশ কর্মচারী যখন মনে করিয়ে দিলেন যে তাতে

কেলেঙ্কারীটা বেশ ক'রে ছড়িয়ে পড়বে এবং যতদূর অশোকের সহকর্মীদের কাছে শোনা গেছে তাতে মিঃ লাহিড়ির কন্যার আগ্রহই বেশি ছিল—সে ক্ষেত্রে অশোকের শাস্তি হবার কোন কারণ নেই। তখন অগত্যা তিনি নিরস্ত হলেন। আরও প্রচুর কটূক্তি ক'রে, নানারকম ভাবে শাসিয়ে কন্যাকে নিয়ে প্রস্থান করলেন। অশোকের ভাগ্যে পড়ে রইল সেই প্রায়-অন্ধকার ঘর এবং অন্ধকার ভবিষ্যৎ।......

কাহিনী শেষ ক'রে এই বয়সেও হু হু কেঁদে ফেললে অশোক।

আমি অনেক ক'রে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। সে ত খেলাতেই এসেছিল, ভালবেসে ত আসেনি। অশোক ত তা আগেই বুঝেছিল, সতর্ক হতেও চেয়েছিল। পারেনি সেটা নিতান্ত বয়সের দোষ। ঐ বয়সে বুঝি পারা যায়ও না। তবু যখন সে একথা জানে যে দীপ্তি তাকে কোন দিনই ভালবাসেনি, ভালবাসতও না, তখন আর দুঃখ ক'রে লাভ কি? এ বরং ভালই হ'ল—যদি সত্যি-সত্যিই ঐ মেয়ের সঙ্গে তার আগে বিয়ে হয়ে যেত, এই স্বপ্নভঙ্গের আগে, আরও সাংঘাতিক অবস্থা হ'ত অশোকের। সেই শোচনীয় অবস্থা থেকে যে সে পরিত্রাণ পেয়েছে, আরও বেশি ক্ষতি যে হয়নি—এই জন্যেই তার ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অনেক বোঝালুম, অনেক আশা দিলুম। পরামর্শ দিলুম ও-বাসা এবং তার স্মৃতি ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে। মা ভাই কিছুই মনে রাখবেন না। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সহ-কর্মীদের মধ্যে যারা জানত তাদের টিটকারিও এ কদিন সহ্য ক'রে যখন প্রায় ভুলিয়ে এনেছে—তখন [illegible] সামনে যেতে ভয়

কি? 'সব ঠিক হয়ে যাবে। চিয়ার আপ!' পিঠ চাপড়ে শেষ সান্ত্বনা দিই।

পাথরের মূর্তির মত বসে বসে সব শুনছিল অশোক। এবার আস্তে আস্তে কতকটা স্বপ্নাবিষ্টের মত বললে, 'কিন্তু আমি—আমি যে এতদিনে তাকে ভালবেসে ফেলেছি! তাকে হারিয়ে আমার জীবনের যে আর কোন অর্থ-ই খুঁজে পাচ্ছি না। এমন ভাবে কী ক'রে বাঁচব বলতে পারেন?'

এইবার আমিও স্তব্ধ হয়ে গেলাম!

অনর্থক

গরমের ছুটির আগে থেকেই কথাটা চলছিল। কথায় কথায় যারা শিলং বা দার্জিলিং এর গল্প করতে পারে তেমন 'শাহান শা' ধরণের কেউ আমাদের দলে ছিল না—সুতরাং অমুকের বাগান-বাড়ী কি অমুকের দেশ—এই প্ল্যান করা ছাড়া আমাদের কোন উপায়ও ছিল না।

একটি মাত্র ধনীসন্তান আমাদের দলে আড্ডা দিত, সে হচ্ছে আমাদের ঠাকুর্দা, মৈনাক দত্তের নাতির নাতি মলয় দত্ত। অবশ্য ওদেরও এখন পড়তি দশা, আগেকার বোল-বোলাও আর নেই, তবু 'যাতে যাতে ভি রহ্ যাতা'—আমাদের চেয়ে ঢের ভাল অবস্থা। ট্রামে বাসে ক'রেই কলেজে আসত কিন্তু প্রতিদিন আমাদের চা খাওয়াতে খরচ হয়ে যেত দু'তিন টাকা। ইদানীং আমরা তার আমন্ত্রণেরও অপেক্ষা করতাম না। চা ইত্যাদি খেয়ে ক্যান্টিনের ছেলেটাকে ব'লে আসতুম—'ঠাকুর্দা দেবে।' কলেজের শেষে যখন বিল আসত তখন বেচারী এক একদিন বেশ বিপন্ন মুখেই বল্‌ত—'করেছিস কী রে—তিনটাকা ছ' আনা শুধু চায়ের বিল! না, না—এমন করিসনি। ফেল হয়ে যাবো।' তারপর হয়ত দুটো টাকা পকেট থেকে বার ক'রে দিয়ে বলত এইনে বাবা এখন দুটো টাকা, বাকীটা কাল দেব! ক্যান্টিনের বয়টা খুশী হয়ে নিয়ে যেত।

ভারি দিলখোলা লোক ছিল ঠাকুর্দা। এক এক দিন সব খরচ ক'রে যাবার সময় ছটা পয়সা ট্রাম ভাড়া আমাদের কারুর কাছ থেকে ধার ক'রে নিয়ে যেত।

বিরাট দেহ ছিল। পাহাড়ের মত—লম্বা চওড়া। আমরা ঠাট্টা করে বলতুম মলয় না হিমালয়। মৈনাকের নাতি নয়—মৈনাকের বাপ! বয়সও একটু বেশী আমাদের চেয়ে, তাই ঠাকুর্দা নামটা সবদিক দিয়েই খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ একদিন ঠাকুর্দাই কথাটা তুললে, 'যাবি মৈনাক দত্তের বাগান বাড়ীতে একদিন? চ'না, বেশ ফিস্ট ক'রে আসা যাবে। এইত কাছেই, কলকাতা থেকে মাইল-আষ্টেকের মধ্যে!'

শশধর বললে, 'রেখে দে বাবা তোর মৈনাক দত্তের বাগান-বাড়ী। ও আমি বাস-এ ক'রে যেতে যেতে অনেকদিন দেখেছি—পোড়ো বাগানবাড়ী—ভূতের বাসা!'

ঠাকুর্দ্দা গরম হয়ে উঠে বললে, 'পোড়ো বাগানবাড়ী! ইস্! জানিস এখনও তিনটে মালী আছে মাইনে করা।'

মনীশ বললে, 'অতবড় বাড়ীতে তিনটে মালী কী হবে বাবা? আর বাড়ীটাতো বোধ হয় ভেঙ্গে পড়ে যাবে এইবার, কতকাল মেরামত হয়নি।'

এবার একটু আহত হ'ল ঠাকুর্দা, বললে, 'নারে না—ভেতরটা বেশ ভালই আছে, in good repair, বাইরেটায় অবশ্য হাত দেওয়া যায়নি। দিলে অন্তত দশটি হাজার টাকা খরচা। বাইশটা সরিক আমরা—জানিস ত? আমার বাবারা খুড়তুতো জাঠতুতো ধরে বাইশ ভাই! কে ঘাড় পাত্‌বে বল?'

আমি তখন কথাটা চাপা দিয়ে দিলাম, 'তা বেশ ত, যেতেই হয়ত সামার ভেকেশনে যাবো। বরং দু'টো তিনটে দিন থাকব। গঙ্গার ধারে ত—অত গরম হবে না।'

ঠাকুর্দা খুশী হয়ে বললে, 'সে বেশ ত। আমি বাবাকে ব'লে

একটা রাঁধুনী আর একটা চাকরের ব্যবস্থা করব। কোন অসুবিধা হবে না। বাসনকোসন, কাঁচের বাসন সবই ত ওখানে আছে!'

সুনীল ফোড়ন কাটলে, 'তা আর নেই! তোমার পূর্বপুরুষরা ইত্যাদি নিয়ে যখন বাগান বাড়ীতে নিয়মিত যেতেন—তখন সবই ত লাগত। সেই সব remnants পড়ে আছে আর কি!'

ঠাকুর্দার মুখটা রাঙ্গা হয়ে উঠল।

গরমের ছুটির আগের দিনটিতে কথা উঠল আবার।

ঠাকুর্দা বললে, 'কী রে তাহ'লে কবে যাবি তোরা?'

'কোথায় রে?' অনেকে সত্যিই ভুলে গিয়েছিল। তারা একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলে।

'বাঃ—ভুলে বসে আছিস এরি মধ্যে? সেই আমাদের বাগান বাড়ী?'

কথাটা মনে পড়ল। তখনই 'লন'-এ গোল হয়ে বসে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সুনীলের দেখলুম তত যাবার ইচ্ছা নেই, ওর বাবা আবার ওকে কোথাও ছাড়তে চান না। কিন্তু আমাদের মিলিত ইচ্ছার সামনে ঘাড় পাততে হ'ল। স্থির হ'ল যে ৫ই জুন আমরা ওখানে যাবো এবং তিনদিন থাকব। ঠাকুর্দা গাড়ীর ব্যবস্থা করবে—ঐদিন সকালে আমরা কলেজের গেটেই অপেক্ষা করব।

অতগুলি ছেলে—জড়ো হওয়া বড় সোজা কথা নয়। অবশেষে একসময় যখন সত্যিই রওনা হলুম তখন দশটা বেজে গেছে—শেষ জৈষ্ঠের আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়ছে। অত গরমে ওখানে যাওয়া—ইলেকট্রিক নেই, পাখা নেই—অনেকেরই

মন দমে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বাগানের ভেতরে গিয়ে গাড়ী থামল তখন মন্দ লাগল না। গাছের ছায়া, ঝিরঝিরে মিষ্টি হাওয়া—গঙ্গা কাছেই ত—শরীর যেন জুড়িয়ে গেল।

বাড়ীটাও বেশ। বাইরে থেকে যতটা পুরোনো দেখায়—আসলে তত পুরোনো নয়। ভেতরটা খুব সম্প্রতিই বোধ হয় মেরামত হয়েছে—বেশ ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার।

প্রকাণ্ড বাড়ী। গাড়ী বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই মস্ত বড় হল। বিলিতি পদ্ধতিতে হল থেকেই বিরাট চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে—ওপরের বারান্দায়—দুদিকে সেই বারান্দা ধরেই অসংখ্য ঘরের সার। সব ঘরেই খাট আর গদির ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া পুরোনো কার্পেট, গদি আঁটা চেয়ার, টানা পাখা, ঝাড়ের আলো—কিছুরই অভাব নেই—তবে সবগুলিই একটু পুরোনো আর অল্প পরিমাণে ধূলিধূসর। কিন্তু কীই বা করা যাবে?

আমাদের ভালই লাগল মোটামুটি। ওপরেই সামনের দুটো ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঠাকুর চাকর আগেই এসে গিয়েছিল। নামা-মাত্র সরবতের গ্লাস ট্রে সাজিয়ে এনে চাকর দাঁড়াল। হ্যাঁ—রাজকীয় আতিথেয়তার কিছু এখনও আছে তাহ'লে!

আমরা সবাই মিলে সরবৎ পান শেষ ক'রে হৈ হল্লা করতে করতে ওপরে উঠলুম। সিঁড়িটা এসে ওপরের বারান্দায় যেখানে পড়েছে—সেটাও বেশ চওড়া হলের মত—সেখানে পৌঁছে হঠাৎ সবাই থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। সামনেই সাবেকী আমলের প্রকাণ্ড এক অয়েল প্রিন্টিং—লাইফ-সাইজ নয়, তার চেয়েও অনেক বড়। চোগাচাপকান পরা বিরাট এক ভদ্রলোক ঈষৎ ভ্রূকুটি ক'রে চেয়ে

আছেন সোজা আমাদের দিকে। যেন আমাদের ধৃষ্টতায় তিনি একটু বিরক্তই হয়েছেন !

সবাই যেন কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছি। ঠাকুর্দা ভারী মানুষ, পিছু পিছু আসছিল, সে এইবার তাড়াতাড়ি সামনে এসে বললে—'ইনিই মৈনাক দত্ত—আমাদের পূর্বপুরুষ !'

'ও, তাই নাকি !' কে যেন বললে, 'আমাদের জ্যোতিষের সঙ্গে খুব সাদৃশ্য আছে, না ?'

আরে ! তাইত !

এতক্ষণ ত এটা আমাদের নজরে পড়েনি।

সত্যিই। জ্যোতিষের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে একটু। জ্যোতিষও অমনি লম্বা চওড়া—অমনি বড় বড় ডাগর চোখ, প্রশস্ত ললাট। চশমাটা বাদ দিলে বেশ একটু মিল পাওয়া যায় সত্যিই ! জ্যোতিষেরও অমনি ভুরু কুঁচকে চাওয়া অভ্যাস আছে।

যাই হোক—আবার আমরা হৈ চৈ করতে করতে ওপরে উঠে গেলুম। তারপর স্নানাহার এবং আড্ডার মধ্যে কথাটা ভুলেই গেলুম।

পরামর্শটা দিলে মনীশ।

ঠাকুর্দা তখন কী একটা কাজে নিচে গেছে। আমরা বসে চা খাচ্ছি বিকেলের দিকে, হঠাৎ গলাটা নামিয়ে মনীশ বললে, 'এই, ঠাকুর্দাকে একটু ভয় দেখাবি ?'

'কী ক'রে রে, কী ক'রে ?'

উৎসাহে সকলেরই চোখ জ্বলে উঠেছে।

'আমাদের জ্যোতিষকে যদি মৈনাক দত্ত সাজানো যায় ? অমনি পোষাক টোষাক পরে ধর যদি রাত দশটার সময় নিঃশব্দে নামে

সিঁড়ি দিয়ে, আবছা অন্ধকার ত—আর সেই সময় যদি কোন একটা ছুতোয় ঠাকুর্দাকে ঐ নিচের হলে এনে দাঁড় করানো যায় —ব্যাপারটা কী রকম হবে বুঝতে পারছিস?'

'ফাইন, ফাইন! মার্ভেলাস!' সবাই চেঁচিয়ে উঠি।

কিন্তু সাজপোশাক?

সুনীল আশ্বাস দেয়, 'আমাদের বাড়ীতে এ সব আছে। আমাদেরও ত খুব পুরোনো ফ্যামিলি। বাবাকে লুকিয়ে এক-দিনের জন্যে বার ক'রে আনতে পারব।'

জ্যোতিষের থিয়েটার করা অভ্যাস আছে। সে তেতে উঠল, 'অমনি মেক-আপের দু একটা জিনিস, আনতে পারবি ত?'

'খুব, খুব!'

ঠিক হ'ল পরের দিন দুপুরে কোন এক ছুতোয় সুনীল বাস-এ করে কলকাতায় যাবে এবং মালপত্র নিয়ে সন্ধ্যের পর কোন-এক ফাঁকে ঢুকে পড়বে। তারপর একেবারে ঐ কোণের ঘরটাতে সব থাকবে ঠিক করা, জ্যোতিষ সময় মত গিয়ে সেজে নেবে।

আনন্দ উত্তেজনায় আমাদের বুক কাঁপতে লাগল।

পরের দিন প্ল্যানমতই কাজ এগোল ঠিক ঠিক।

সাড়ে সাতটার ভেতর সুনীল ফিরে এল। পোষাক যা এনেছে—একেবারে হুবহু মৈনাক দত্তের মত। মায় ঘড়ির মোটা গার্ডচেনটা পর্যন্ত ভুল হয়নি ওর। মেক-আপের কিছু কিছু সাজ-সরঞ্জামও এসে গেছে।

ঠাকুর্দা ওকে বাইরে থেকে আসতে দেখে অবাক হ'ল না। কারণ আমরা আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছিলুম যে, বাপের আদুরে ছেলে সুনীল বাবাকে দেখা দিতে গেছে একবার। এই সর্তেই নাকি ও

এসেছিল।

খুব ঠাট্টা করতে লাগল ঠাকুর্দা, 'যা যা কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খেগে যা—আদুরে খোকা!'

আগেকার শেখানো-পড়ানো মত রাত আটটার সময় জ্যোতিষ হঠাৎ বলে বসল, 'তোরা গল্প কর্, আমি ভাই একটু চট্ ক'রে ঘুরে আসছি!'

'সে কী রে কোথায় যাবি?' আমরা যেন অবাক—এমন ভাব দেখালুম।

'এই কাছেই মাইল-খানেকের মধ্যে আমার মাসীর বাড়ী। বহুকাল আসা হয়নি। চট্ ক'রে ঘুরে আসছি।'

আমরা বাধা দিলুম খুব। ঠাকুর্দা রাগ করতে লাগল। 'তোরা বড় বেরসিক। দুপুরে সুনীলটা কোথা ডুব মারল, এখন আবার জ্যোতিষটা—এমন করলে আড্ডা জমে না।'

'এই যাবো আর আসব।' জ্যোতিষ পীড়াপীড়ি করে।

আরও খানিকটা পরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেড়ে দেওয়া হ'ল জ্যোতিষকে। সাড়ে আটটার পর জ্যোতিষ রওনা হ'ল। এসবই আমাদের গড়া পেটা ছিল, জ্যোতিষ আমাদের দেখিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কাছেই কোথাও অপেক্ষা করবে—তারপর পথ খোলা পেলেই একসময় এসে নিঃশব্দে উঠে যাবে কোণার সেই ঘরে। সেখানে মোমবাতি দেশলাই আয়না—সব প্রস্তুত আছে। জ্যোতিষের পকেটে টর্চও আছে।

জ্যোতিষ চলে যেতেই আমরা ধরলুম, 'চলো ঠাকুর্দা গঙ্গার দিকে বেড়াতে যাই—'

লোক নেই, শ্বশুর পঙ্গু, অসমর্থ। কে বৈদ্য ডাকে? ধারে-তেমন কোন বৈদ্যও নেই। যারা ছিল সবাই পলাতক। মা- মনে পড়ল ছাউনীতে মিলিটারী সার্জ্জন আছে একজন—ডাক্তার—যদি তার হাতে পায়ে পড়া যায়, দয়া কি হবে না?

তখন অত ভাববার সময় নেই, বিবেচনারও নয়। মালতী লের মত রাস্তায় বার হয়ে দৌড়াতে লাগল ছাউনীর দিকে।

কিন্তু ছাউনী পর্যন্ত যাবার আগেই এক ঘটনা ঘটল। মহা ইসমাইল নামে এক তেলেঙ্গী সিপাই আর গাফ নামে (নামটা মনে নেই পূজারীর, তবে ঐরকমই হবে) একজন ফিরিঙ্গী গোরা ছাউনি থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিল, ঐ পথে চুপি চুপি ফির তারা, সেদিনও বৈশাখী পূর্ণিমা। মদোন্মত্ত ফৌজী সিপাই নি পথে সুশ্রী তরুণীকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল। দুজনে দু'টো হা নিয়ে চলল অপেক্ষাকৃত নিরালা বনছায়ার উদ্দেশে—মালতী কান্না কাকুতি-মিনতি ঢের করল। গোরা গাফ তার কথা বুঝল না। ইসমাইল বুঝল। অসুস্থ স্বামীকে ফেলে সতী নারী উন্মাদিনীর বলতে গেলে বাঘের গুহায় যাচ্ছিল, কথাটা শুনে নরম হ'ল তার অবশেষে দুর্দান্ত গাফ যখন মালতীর প্রতি চরম অত্যাচারে উদ্যত সে ইস্‌মাইলের পায়ে পড়ে বললে, 'তুমি আমার দাদা, আমি ছোট বোন, আমাকে বাঁচাও।' তখন সে আর স্থির থাকতে না। তারও ঘরে একটি ছোট বোন ছিল, সে তাকে ভালও বা সে গাফের হাত ধরে বললে, 'বাস, খবরদার। ছেড়ে দাও ওকে।

গাফের সেদিন নেশার মাত্রা বেশী হয়েছিল। চোলাই-মদ, তার সঙ্গে এদেশের লোকেরা চড়াদামে সাহেবদের কা

এসেছিল।

খুব ঠাট্টা করতে লাগল ঠাকুর্দা, 'যা যা কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খেগে যা—আদুরে খোকা!'

আগেকার শেখানো-পড়ানো মত রাত আটটার সময় জ্যোতিষ হঠাৎ বলে বসল, 'তোরা গল্প কর্, আমি ভাই একটু চট্ ক'রে ঘুরে আসছি!'

'সে কী রে কোথায় যাবি?' আমরা যেন অবাক—এমন ভাব দেখালুম।

'এই কাছেই মাইল-খানেকের মধ্যে আমার মাসীর বাড়ী। বহুকাল আসা হয়নি। চট্ ক'রে ঘুরে আসছি।'

আমরা বাধা দিলুম খুব। ঠাকুর্দা রাগ করতে লাগল। 'তোরা বড় বেরসিক। দুপুরে সুনীলটা কোথা ডুব মারল, এখন আবার জ্যোতিষটা—এমন করলে আড্ডা জমে না।'

'এই যাবো আর আসব।' জ্যোতিষ পীড়াপীড়ি করে।

আরও খানিকটা পরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেড়ে দেওয়া হ'ল জ্যোতিষকে। সাড়ে আটটার পর জ্যোতিষ রওনা হ'ল। এসবই আমাদের গড়া পেটা ছিল, জ্যোতিষ আমাদের দেখিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কাছেই কোথাও অপেক্ষা করবে—তারপর পথ খোলা পেলেই একসময় এসে নিঃশব্দে উঠে যাবে কোণার সেই ঘরে। সেখানে মোমবাতি দেশলাই আয়না—সব প্রস্তুত আছে। জ্যোতিষের পকেটে টর্চও আছে।

জ্যোতিষ চলে যেতেই আমরা ধরলুম, 'চলো ঠাকুর্দা গঙ্গার দিকে বেড়াতে যাই—'

'চলো।' ঠাকুর্দার মহা উৎসাহ।

বেড়ানো শেষ ক'রে ঘড়ির হিসাব মতই আমরা ফিরে এলাম। আসল বাড়ীটার পাশে রান্না-মহল, ঠাকুর-চাকররা সেখানে রান্নায় ব্যস্ত। হলের দরজা খোলা—আমাদেরই জন্য। হলের মাঝের ঝাড়টা জ্বালানো হয়নি—একপাশে একটা দেওয়াল-গিরির আলো জ্বলছে। আলো বেশ জোর—কিন্তু অতবড় হলঘর-খানায় সে আর কতটুকু? অধিকাংশই আব্ছা অন্ধকার হয়ে রয়েছে। বেরোবার সময় আবার মনীশ আলোটাকে এমন কায়দা ক'রে রেখে গেছে যাতে ওরই মধ্যে একটু যা আলো সিঁড়িটাতেই পড়ে।...

আমরা এমন ভাবেই সময়টা ঠিক ক'রে নিয়েছিলুম যে আমরা ঠিক গাড়ীবারান্দার নিচে এসে দাঁড়িয়েছি আর দূরে কোন বাগানবাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দশটা বাজতে শুরু হ'ল।

আমরা পূর্বপরামর্শমত হলের দোরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালুম। শশধর বললে, 'জ্যোতিষটার ত এখনও পাত্তা নেই। কী হবে—এই গরমে ঘরে গিয়ে এখন থেকে? তার চেয়ে আয় বাইরের চাতালে বসে তাস খেলি একটু!'

'মন্দ নয়। মন্দ নয়! বেশ বলেছ, মাইরি!' সবাই আমরা সমর্থন জানাই। সুনীল বলে, 'ঠাকুর্দা, আমার ব্যাগে তাসটা আছে, নিয়ে এসোনা ভাই—'

ঠাকুর্দা একবার আধো-অন্ধকার ওপরটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি একা যাবো? তোরা কেউ চ'না—'

'কেন তোমার কি ভয় কচ্ছে? ভয় করে ত বলো আমিই যাচ্ছি।' চিম্‌টি কেটে বললে মনীশ।

'না না, ভয় কেন! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—'

ঠাকুর্দা একা হলে গিয়ে ঢুকল। আমরা সবাই অন্ধকারে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। ঠিক সেই সময় ওপরের দিক থেকে সিঁড়ির মুখে কার জুতোর আওয়াজ উঠল, মস্ মস্ মস্!

সবাই তাকিয়ে দেখলুম।

বাহবা বা, বাহাদুর ছেলে বটে জ্যোতিষ!

কী সেজেছে মশাই—একেবারে সেই ছবির মৈনাক দত্ত! হুবহু। যেন মনে হচ্ছে ঐ ছবিটাই নেমে আসছে জীবন্ত হয়ে। আর তেমনি ভারিক্কি চলনটাও অভ্যাস করেছে ত ছোকরা! বলিহারী!

মূহূর্তকয়েক সেদিকে তাকিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল ঠাকুর্দা। যেন পাথরই হয়ে গিয়েছে।

আর জ্যোতিষ নামতে লাগল—মস্ মস্ মস্—

তারপরই গাঁ গাঁ ক'রে একটা বিকট চিৎকার করতে করতে ঠাকুর্দা এক লাফে বাইরে এসে রাস্তার ওপরই প্রচণ্ড শব্দ ক'রে পড়ল—অজ্ঞান হয়ে!

আমরা ঠিক এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। বিষম অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে ধরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

বিপদের ওপর বিপদ। ওর ঐ বিকট আর্তনাদে ঠাকুর-চাকররা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল রান্নামহল থেকে।

ততক্ষণে মৈনাক দত্ত ওরফে জ্যোতিষ হল পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বাগানের দিকে চলেছেন।···

জ্যোতিষের দোষ নেই, অভিনয়টা সে নিখুঁত করতে চায়। কিন্তু আমাদের মনে হ'ল, আর কি দরকার ছিল এত বাড়াবাড়ি করবার?

বাইরের গাড়ী বারান্দায় একটা মিটমিটে তেলের আলো ঝুলছিল, চাকরের হাতেও ছিল একটা লণ্ঠন। আগেকার ঐ চিৎকার এবং বর্তমানে সামনের এই মূর্তি—দেখে তারাও অদ্ভুত একটা শব্দ করতে করতে ছুটল ফটকের দিকে। বোধ হয় রাত থাকতে এই ভুতুড়ে বাড়ীতে তারা আর ফিরবেনা!

চোখে আমরা—যাকে বলে অন্ধকার দেখলুম পুরোপুরি।

সুনীল মনীশকে গাল দিতে লাগল, 'তোর পরামর্শেই ত এই কাণ্ডটি ঘটল!'

আমি তাড়াতাড়ি তাকে থামাই।

'ওরে সে সব পরে হবে। এখন এদিকে ছ্যাখ।'

সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে এনে ঠাকুর্দাকে হলের মেঝেতেই ফেললুম, শশধর রান্নাঘর থেকে জল নিয়ে এল, চোখে-মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগলুম। রান্নাঘর থেকেই একটা পাখা সংগ্রহ ক'রে আনলে মনীশ। ভাগ্যে আমার পকেটে একটা টর্চ ছিল। ঠাকুররা ত আলো নিয়েই পালিয়েছে! যাই হোক মালি-গুলো থাকে বাগানের এককোণে। হৈ চৈ শুনে তারা এসে পড়ল এই রক্ষা। তাদের আর আসল কথাটা বলা হ'ল না। কোনমতে দুপাঁচটা মিছে কথা বলে ঠাণ্ডা করা হ'ল। তাদেরই একজন ছুটল ঠাকুর চাকরকে খুঁজে আন্‌তে।

প্রচুর জল এবং বাতাসের পর ঠাকুর্দা একসময় একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে চোখ মেলে তাকাল…

তখন ওকে উঠিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল।

আর একটু প্রকৃতিস্থ হ'তে আমাদের অপরাধ স্বীকার করা হ'ল। ঠাকুর্দা ত প্রথমে খুব চটে উঠল, যা-তা ক'রে বকলে,

বললে, 'ত্যাখ দিকি—আমার যদি হার্ট ফেল করত? এমন চ্যাংড়ামি মানুষে করে!'

আমরা বললুম, 'তুমি যে এমন সাহসী বীরপুরুষ তা কেমন ক'রে জানব বলো।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ। অমন অবস্থায় পড়লে সবাই সমান বীরপুরুষ। আমার জানা আছে।··· দাঁড়া জ্যোতিষ ইষ্টুপিডটা আসুক—দেখাচ্ছি মজা তাকে!' এবার সে হেসে ফেললে। অর্থাৎ রাগ নেই বুঝলুম। বাঁচা গেল।

কিন্তু সত্যিই ত—জ্যোতিষটা গেল কোথায়?

ঠাকুর্দার কথায় মনে পড়ল আমাদের।

সেই যে বাগানের পথে অন্ধকারে কোথায় বেরিয়ে গেল—কৈ, আর ত ফিরল না! সে বোধ হয় লজ্জায় ফিরছেনা তাহ'লে।

ঠাকুর্দা বললে, 'কোন ফাঁকে হয়ত ফিরে এসেছে ত্যাখ—মেকাপ ধুচ্ছে!'

'না-না! আমরা ত সমস্তক্ষণ দোর জোড়া ক'রে বসে। যাবে কোথা দিয়ে।'

তা বটে। কিন্তু গেল কোথায়? রাত-বিরেতে অন্ধকারে?

ঠাকুর্দা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

শেষে মালী দুটোকে পাঠানো হ'ল বাগানে খুঁজতে। আলো নিয়ে তারা দুজনে দুদিকে গেল। বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল মৈনাক দত্তের মত চোগাচাপকান দেখে যেন ভয় না পায়।

তারপর আমরা সবাই ঠাকুর্দাকে ধরে ধরে ওপরে তুললুম। হাত পা ছড়ে গিয়েছিল বেচারীর, ঠোঁটের একটা দিক ফুলে উঠেছে। 'ফার্স্ট এড' দেওয়া দরকার।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই সকলকার নজরে পড়ল, ওপাশের কোণের ঘরে একটা আলোর শিখা বাতাসে কাঁপছে। দেখেছ ছোকরার কাণ্ড! বাতিটা নিভিয়ে যায়নি।

ঠাকুর্দা মনীশকে বললে, 'যা বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে আয়।'

মনীশ নিশ্চিন্ত ভাবেই গেল আলো নেভাতে কিন্তু দোরের কাছে পৌঁছেই সে-ও একটা চীৎকার দিয়ে উঠল।

আবার চীৎকার!

আমরা সবাই ছুটে গেলাম। তবে দোরের সামনে যেতেই যা চোখে পড়ল তাতে চিৎকার দেবারই কথা।

মস্তবড় বাতিটা এখনও জ্বলে শেষ হয়নি। তারই আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা।

পোশাক, মেকাপের সরঞ্জাম চারদিকে ছড়ানো—তারই মধ্যে খালি গায়ে জ্যোতিষ ঘরের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে।

এ কী কাণ্ড!

ভয় দেখাতে গিয়ে শেষে নিজেই ভয় পেয়ে গেল?

শশধর গম্ভীর ভাবে বললে, 'অমন হয়। অভিনয় করতে করতে তন্ময় হয়ে গেছে একেবারে, আর কি!'

'কিন্তু এল কোথা দিয়ে?' সুনীল প্রশ্ন করে।

তাইত!

শেষে ঠাকুর্দাই বুঝিয়ে দেয়, 'কখন্ কোন ফাঁকে উঠে এসেছে। তোরা হয়ত লক্ষ্য করিসনি, আমাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলি। পায়ে ত জুতো নেই দেখছি। জুতো খুলে হাতে ক'রে এসেছে হয়ত। তাই আওয়াজ পাসনি।'

সে যাই হোক—আমরা কুঁজো থেকে জল নিয়ে ওর মুখে-চোখে ছেটাতে লাগলুম। মনীশ বাতাস করতে লাগল।

অনেকক্ষণ সময় লাগল জ্যোতিষের জ্ঞান হ'তে।

ঠাকুর্দা উদ্বিগ্ন হয়ে বার বার বলতে লাগল, 'ছ্যাখো দিকি কী কাণ্ড! এমন ইয়ার্কি করার দরকারটা কি!'

যেন ভয় পেয়ে শিউরে উঠল একবার জ্যোতিষ।

'কীরে, ভয় কি, ভয় কি। এই ত আমরা।'

'আঃ।' আরামের নিঃশ্বাস ফেলে সে এবার।

আর একটু সুস্থ হ'তে প্রশ্ন করি, 'তুই এলি কখন—কোথা দিয়ে?'

'সে ত তখনই, তোরা তখন গঙ্গার দিকে সবে রওনা হয়েছিস।'

'না না—সে আসা নয়—মানে এসে আবার পোশাক টোশাক ছাড়লি কখন?'

'কৈ আর কোথাও যাইনি ত!'

আবারও শিউরে উঠল জ্যোতিষ। সেই সঙ্গে আমরাও।

'তার মানে?'

একটু চুপ ক'রে থেকে সে যেন মনে মনে খানিকটা বল সঞ্চয় করল, 'এসে ত খানিকটা ও ঘরে শুয়ে বই পড়লুম। পড়তে পড়তে দেরি হয়ে গেছে—যখন খেয়াল হ'ল তখন পৌনে দশটা বাজে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সবে জামাটামা খুলে পেণ্টটা নিয়ে বসেছি—বারান্দায় জুতার শব্দ। তোরা কেউ ফিরছিস মনে ক'রে অতটা গ্রাহ্য করিনি। ভাবলুম যে আমাকে হয়ত তাড়া দিতে এসেছিস কেউ, কী দেখতে এসেছিস আমার কত

দেরি, তাই ওদিকে না চেয়েই জোরে জোরে হাত চালাচ্ছি। শব্দটি এসে এই দোরের বাইরে থামল, দোরটাও কে খুললে—টের পাচ্ছি কিন্তু মুখ তুলিনি।··· একটু পরে হুঁশ হ'ল। দোরটা খুলল অথচ কেউ ঘরে ঢুকলও না, কিম্বা কথাও বলল না—কী ব্যাপার? তখন পেছন ফিরে চাইলুম—'

'তারপর?' কম্পিত কণ্ঠ আমার—তা নিজেই বুঝতে পারলুম।

'তারপর যা দেখলুম'—জ্যোতিষেরও গলা কাঁপছে, 'দেখলুম ঐ ছবির মৈনাক দত্ত আমার সামনে, দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে, মুখে কুটিল একটা হাসি। হুবহু ঐ মূর্তি, ছবিতে যেমন আঁকা আছে।···তারপর আর কিছু জানিনা—একেবারে তোদের দেখছি।'

ঠাকুর্দা একটা গোঁ গোঁ শব্দ ক'রে দ্বিতীয়বার মূর্ছিত হয়ে পড়ল। *

* একটি সত্য ঘটনার কথা শুনেছিলাম এক অধ্যাপক বন্ধুর কাছে। তাই থেকেই গল্পটির উৎপত্তি। —লেখক।

বোম্বাই মেলে কাশী যাচ্ছিলাম। মোগলসরাইতে গাড়ী বদল করতে হয় বটে—তবু এই গাড়ীতে যাওয়াই সুবিধা, মানে যদি থার্ড ক্লাসে যেতে হয়। কারণ এই একমাত্র গাড়ী ঐ লাইনের—যাতে গান্ধী ক্লাসে (বা একশ' এগারো—যাই নাম দিন—) একটু জায়গা মেলে—কারণ তার আগেই ঐ লাইনে পর পর অনেকগুলি দ্রুতগামী ট্রেন যায়। অত শেষের গাড়ী পর্যন্ত বসে থাকবার ধৈর্য আছে ক'জনের? তাছাড়া—চুপি চুপি বলি—দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও কম—নয় কি? আগে সার সার অতগুলি গাড়ী যায়, যা কিছু বিপদ আপদ তাদের ওপর দিয়েই ঘট্‌তে পারে। এ গাড়ীতে ভীড় হয়—মোগলসরাইয়ের পর থেকে—কিন্তু সে আমার ভাববার কথা নয়।

এখন যা বল্‌ছিলাম,—। গাড়ীতে ত উঠলাম, অভ্যাস মত ওপরের আসনে বিছানা বিছিয়ে একটা গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে আরাম ক'রে শুয়েও পড়লাম। কারণ যদিচ তখন কামরা একেবারে খালি—কিন্তু দীর্ঘদিনের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতায় এইটুকু শিক্ষা হয়েছে যে, 'বিশ্বাস নৈব কর্তব্যং—থার্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জারেষু!' কবে কোথা থেকে যে হুপ ক'রে ভীড় ঠেলা দেয় তা কেউ বল্‌তে পারে না।

আর হ'লও তাই।

যখন আর মাত্র দশটি মিনিট বাকী তখন একদল বিকানীর-প্রবাসী (কলকাতায় যাঁদের জীবনের অধিকাংশ দিন কাটে তাঁদের কি বিকানীরবাসী বলা উচিত?) ভাই বিচিত্র মোটঘাট, গাঁজার

কল্‌কে, লোটা মাটি প্রভৃতি যথারীতি নিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে উঠলেন এবং দু'খানি বেঞ্চি মালে ও মানুষে ভরিয়ে ফেল্‌লেন। তার আগেই একটি বাঙ্গালী ছোক্‌রা এবং এক গুজরাটি ক্রোড়পতি (তাঁর সারা ভারতে মোট সাতটি জুয়েলারী দোকান!) বৃদ্ধ এসেছিলেন কিন্তু তাতেও হ'ল না—একেবারে শেষ দু' মিনিট থাক্‌তে এক শিখ সর্দার ও তাঁর বিহারী ভৃত্য প্রকাণ্ড কয়েকটি কাপড়ের 'গাঁট' নিয়ে উঠে গাড়ী ঠেসে ফেল্‌লেন।

এবারের যাত্রাটা শুভ হয়নি—শুয়ে শুয়ে এই কথাটাই চিন্তা কর্‌ছি এমন সময় সর্দারজী ও তাঁর মালবহনকারী গুটি-পাঁচেক মুটের বচসা ছাপিয়ে একটি মিষ্ট-গম্ভীর নারীকণ্ঠ কানে এল, 'আরে এই—রাস্তা ছোড় দেও বেটা!'

বিস্মিত হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলুম—নারীই বটে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী! রক্তাম্বরা, ত্রিশূলধারিণী, রুদ্রাক্ষ-কণ্ঠমালা শোভিতা—যাকে বলে রীতিমত ভৈরবী মূর্তি। এককালে রূপসীও ছিলেন—যৌবন অতিক্রান্ত ক'রে আসা সত্ত্বেও সে প্রমাণ তাঁর দেহ থেকে একেবারে লোপ পায়নি।

এক বিকানীরওয়ালা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিলেন—তিনি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালেন, 'মাতাজী—উধার যাইয়ে, জানানা কামরামে, হিঁয়া জায়গা কঁহা?'

অনাবশ্যক বোধেই হয়ত মাতাজী সে কথার উত্তর দিলেন না! নীরবে তাঁর দীর্ঘ আয়ত চোখের দৃষ্টিতে একটি চরম উপেক্ষা হেনে তিনি একরকম তাকে ঠেলেই গাড়ীতে উঠে পড়লেন। অবশ্য তখন আর সময়ও ছিল না—তিনি ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী ছেড়ে ছিল। মুটেগুলো নাম্‌ল চল্‌তি গাড়ী থেকেই!

ভৈরবী ভেতরে ঢুকে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন। কঠিন, শীতল দৃষ্টি। তারপর ঘটোৎকচের মত 'কুরু কুল চেপে' পড়লেন অর্থাৎ সর্দারজীর কাপড়ের মোট ডিঙ্গিয়ে বিকানীর-ওয়ালাদের দিকে চলে গেলেন এবং বেশ মিষ্টগম্ভীর কণ্ঠেই বল্‌লেন, 'ভাই, জেরা জায়গা দেও ত—হঠো জেরা।'

একজন একটু প্রতিবাদ কর্‌তে গেলেন ওর ভেতর থেকে, বেশ রূঢ় ভাবেই, 'উধার যাইয়ে না মাতাজী—উধার আদ্‌মী কম হ্যায়!'

'কেঁও—ইধার ভি ত বহুত জায়গা হ্যায়! হঠো— ইধার বৈঠ্‌নে দেও—'

এই বলে তিনি এমন ভয়ঙ্কর ভঙ্গীতে ত্রিশূলটা বাগিয়ে ধর্‌লেন যে কতকটা ভয়ে ভয়েই ও বেঞ্চের অধিবাসীরা সরে বস্‌ল। মাতাজী দরজার কাছে জানলার ধারের বেঞ্চের আরাম-প্রদ কোণটি দখল ক'রে বস্‌লেন।···

বসলেন তিনি গাড়ীর আরোহীদের দিকে পিছন ফিরেই, জানলার দিকে মুখ ক'রে। আমার আস্তানা থেকে তাঁকে দেখা গেলেও আলো-আঁধারী হচ্ছিল, মুখটা ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিল না।—তাছাড়া মুখ তিনি তখন বাইরের দিকেই ফিরিয়ে। তবু কৌতূহল দমন করা কঠিন ব'লে প্রাণপণে তাঁর দিকেই চেয়ে ছিলাম। ফলে তিনি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সোজা আমার দিকে চাইতে একটু অপ্রস্তুত হয়েই পড়লাম বৈ কি!

তিনি কিন্তু ওসব কিছু গ্রাহ্য করলেন না। আমার দিকে ফিরে পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন করলেন, 'এটা রাঁচির গাড়ী ত?'

চমকে উঠে ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'না, না—আপনি বিষম ভুল করেছেন। রাঁচির গাড়ী ছাড়ে ন নম্বর থেকে, আর একটু পরে—নটা পঞ্চাশ বোধ হয়। এ যে আপনার বোম্বাই মেল! কী সর্বনাশ! বড্ড ভুল করেছেন ত!'

সহযাত্রীদের কেউ কেউ মূল্যবান উপদেশ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন কিন্তু সবাইকে নিরস্ত ক'রে শান্তকণ্ঠে ভৈরবী বললেন, 'বম্বে মেল তা আমি জানি, কিন্তু এক চেকার বাবু ত বললেন, এতেও যাওয়া যাবে!'

বললাম, 'হ্যাঁ তা অবশ্য যাবে। হাজারীবাগ রোডে নেমে বাসে যেতে পারবেন—'

'তাতেই হবে। ও গাড়ীতেও আমি গেছি অনেকবার। সে-ও ত মুরীতে নেমে বাসে যাওয়া—।'

বেশ শান্ত নিশ্চিন্ত কণ্ঠস্বর।

এতখানি উদ্বেগ এবং জ্ঞান কাজে লাগল না ব'লেই বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণ বোধ করলাম। বললাম, 'কিন্তু অনর্থক এতে ঘুর হবে একটু। এ পথটা বেশী।'

'তা হোক গে। আমায় ত আর ভাড়া দিতে হবে না। আমার অত হিসেবে দরকার কি!'

তারপর কতকটা যেন অকারণেই বললেন, 'আমার কোথাও ভাড়া লাগে না।'

'কেন?' মুখ থেকে প্রশ্নটা হঠাৎ বেরিয়ে যায়।

এবার তাঁর বিস্মিত হবার পালা। তিনি একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেন, 'কেন কি? আমি যে সন্ন্যাসিনী। আমার কাছে ভাড়া চাইবে কে? আর চাইলেই বা আমি দেব কেন?'

তা বটে। এ অকাট্য যুক্তির কোন উত্তর নেই। অগত্যা চুপ ক'রে রইলাম।

ভৈরবীর সঙ্গে আর কোন মাল ছিল না—শুধু কাঁধে একটি ঝুলি ছাড়া। এবার তিনি সেই ঝুলি নিয়ে পড়লেন। তা থেকে বেরোল ওড়িয়াদের মত একটি পানের বটুয়া। তা থেকে পান-চুন-খয়েরের একটা কৌটো, সুপুরির পুঁটুলি, দোক্তা এবং জাঁতি। বেশ পরিপাটি ক'রে বসে বসে ধীরেসুস্থে পান সাজলেন তিনি। তারপর আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'খাবেন নাকি বাবা একটা পান?'

সবিনয়ে জানালাম যে 'পান-দোষ আমার নেই!'

'তা সে এক রকম ভাল বাবা, এ ছাই-ভস্ম অভ্যেস না করাই ভাল।'

এই ব'লে তিনি যে ক-টি খিলি সেজেছিলেন তার সব ক-টিই এক সঙ্গে বদন-বিবরে প্রেরণ ক'রে তার সঙ্গে বেশ জমিয়ে চুণ-দোক্তা গালে ফেলে পানের পাট সেরে ফেললেন এবং গলা থেকে একটি মালা খুলে জপ করতে লাগলেন।

গাড়ীর বাকী যাত্রীরা যেন এতক্ষণ কতকটা বিস্ময়াহত ভাবেই স্তব্ধ হয়ে ঐ দিকে চেয়েছিলেন। ভৈরবী মালা জপে মন দিতে এবার সকলে একটু সহজ হ'লেন। শুরু হ'ল আলাপ এবং গুঞ্জন। বিকানীর-ওয়ালারা ছোট কলকে এবং ভিজে ন্যাকড়া বার করলেন, ওঁদেরই একজন কানে পৈতে গুঁজে বাথরুমে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে এক বালতি জল এবং একরাশ মাটি নিয়ে গাড়ীর ভেতরই বন্যা বইয়ে দিলেন, সেই উপলক্ষ্য ক'রে সর্দারজীর সঙ্গে এক চোট কলহও বেধে উঠল, কারণ

তাঁর কাপড়ের গাঁট সবই মেঝেতে—ভিজলে বহু টাকা লোকসান হবে। এই সব কোলাহলের মধ্যে আগাথা ক্রিস্টীর রোমাঞ্চকর 'থ্রিলার'-এ মনটা দোল খেতে খেতে গাড়ী এক সময় বর্ধমান এসে গেল। সুখের কথা এ গাড়ীতে কেউ উঠল না—নামলও না। বর্ধমান ছাড়বার পর এক সময় হাত থেকে বইখানা খসে পড়ল —অর্থাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম।

একেবারে আবার সচেতন হলাম আসানসোলে আসতে। টিকেট চেকার উঠেছেন—তাঁরই ধাক্কায় ঘুম ভাঙল। টিকেট দেখিয়ে আবার চোখ বুজবার কথা। কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কায় ঘুম ছুটে গেল। সর্দারজী, যিনি অন্তত মণ-দশবারো কাপড়ের গাঁট নিয়ে উঠেছেন গাড়ীতে, তাঁর টিকেট নেই,—না তাঁর, না তাঁর চাকরের। মালের ভাড়ার ত প্রশ্নই ওঠে না।

চেকার মশায় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পকেট থেকে টেব্‌ল্ বার ক'রে ভাড়া হিসেব করলেন—তারপর টাকাটা চেয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। সর্দারজীও কেমন এক রকম ক'রে তাকালেন। তারপর বললেন, 'পাশের গাড়ীতে আমার জান-পছানা লোক আছে তার কাছ থেকে চেয়ে দেবো চলুন!'

চেকার এবার বাকী যাত্রীদের দিকে মন দিলেন। ভৈরবীর কাছেও গিয়ে দাঁড়ালেন। ভৈরবী তখনও জপ ক'রে চলেছেন। তিনি চেকারের কথার উত্তর দিলেন না—তাকালেনও না—যেমন জপ করছিলেন, তেমনি আত্মস্থ ভাবে জপ ক'রে চললেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে চেকার বাবুটি সরে পড়লেন। হয়তো বা ত্রিশূলের দিকে তাকিয়েই জোর তাগাদা

করার সাহস হ'ল না। তাছাড়া গাড়ী ছাড়বার সময়ও আসন্ন— চুণোপুঁটির দিকে মন দিলে রুই কাতলা ফস্‌কায়।

সর্দারজী এবং চেকার বাবুটি নেমে গেলেন। একটু পরেই সর্দার হাসি হাসি মুখে ফিরে এলেন এবং সগর্বে একবার চারদিক তাকিয়ে নিরীহ বাঙালী ছোকরাটিকে আরও কোণ-ঠাসা ক'রে নিজের বিছানা বিছিয়ে নিলেন। একটু হেসে চাকরের দিকে ফিরে যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই—এবার নিশ্চিন্ত। গয়া পর্যন্ত আর কেউ জ্বালাতন করবার রইল না। আর গয়া পৌঁছতে পারলে ত কথাই নেই। সেখানে রোখে কে!

এতক্ষণে বোধ করি ভৈরবীরও মালাজপা শেষ হয়েছে। তিনি মালাটি কপালে ছুঁইয়ে গলায় পরে নিলেন, তারপর আবারও ঝুলি থেকে পানের সরঞ্জাম বার ক'রে পান সাজতে বসলেন। আমি সেদিকে চেয়ে আছি বুঝেই বোধ করি সহসা মুখ তুলে বললেন, 'লাখ লাখ টাকার কারবার করছেন বাবুরা, তাঁরা রেলের ভাড়া দেবেন না—তু পয়সা ঘুষ দিয়ে সারবেন; সন্নিসী ফকিরের কাছে হাত পেতে টিকিট চাইতে লজ্জাও করে না। কী বলব জপে ছিলুম তাই—নইলে বাবার নাম ভুলিয়ে দিতুম অমন চেকারের। ওর ঘুষ নিয়ে কোম্পানীর সর্বনাশ করা বার করে দিতুম!'

এই বলে তিনি এমন এক উগ্র দৃষ্টিতে সর্দারজীর দিকে তাকালেন যে সে ভদ্রলোকের এতক্ষণের গর্বোদ্ধত হাসি নিমেষে মিলিয়ে মুখ কালি হয়ে উঠল। তিনি গম্ভীর হয়ে মাথা নামিয়ে নিজের ডান হাতের কররেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইতি-পূর্বে তাঁর পাশের বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে তু একটি কথা থেকেই

বুঝেছি যে তিনি বাংলা ভাল বলতে না জানলেও বোঝেন বেশ।

পান দোক্তার পাট চুকিয়ে ভৈরবী বেশ শব্দ ক'রে একটি হাই তুললেন। তারপরই এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। বিকানীর-ওয়ালাদের কয়েকটি ভারি ভারি মাল সরিয়ে তার ওপর ওদেরই বিছানায় বাণ্ডিলগুলো সাজিয়ে বেশ সমান একটি জায়গা ক'রে নিলেন এবং এক রকম হাত দিয়ে ঠেলেই পাশের একটি তরুণকে সরিয়ে দেহের অর্ধেককে বেঞ্চে ও বাকী অর্ধেককে মালের ওপর প্রসারিত করে বেশ আরামে শুয়ে পড়লেন এবং শুয়েই চোখ বুঝলেন। গাড়ীর অন্য সকলের মুখভাব কেমন হ'ল তা দেখবার চেষ্টাও করলেন না—শুধু শোবার আগে একবার উদাত্ত কণ্ঠে ডাকলেন, 'তারা, তারা—মা, মাগো।'

বিকানীর-ওয়ালারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন, একবার আমাদের দিকেও। কিন্তু তাতে যে কোন লাভ নেই, তা তাঁরাও বুঝলেন। কতকটা হতাশ হ'য়েই বাকী স্থানটুকু অবশিষ্ট মালে ভরিয়ে আরাম করবার আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁদের যে মাল ভৈরবী দখল ক'রে নিয়েছেন তার জন্যও দাবী জানাতে সাহস হ'ল না—কারণ যদিও প্রায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ভৈরবীর নিঃশ্বাস ভারি ও নিয়মিত হয়ে এসেছে, তবু তাঁর হাতের ত্রিশূলটি কিন্তু শিথিল হয়নি, বজ্রমুষ্টিতেই যেন বাগিয়ে ধরে আছেন!

তারপরও বহুক্ষণ জেগে রইলাম। গোমোতে গাড়ী এল ছেড়ে গেল, ভৈরবীর একটু একটু নাক ডাকতেও শুরু করেছে ইতিমধ্যে কিন্তু তাঁর হাতের সে বজ্রমুষ্টি একবারও শিথিল হ'ল না—ত্রিশূল উদ্যতই রইল।

হয়ত একটু তন্দ্রাই এসেছিল। এক সময় চমকে উঠে দেখি

একটা বড় স্টেশনে গাড়ী এসেছে। কানে গেল পোর্টার হাঁকছে 'হাজারীবাগ রোড। হা-জা-রী-বা-গ রো-ড।'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভৈরবীর কথা। তাঁর ত এইখানে নামবার কথা।

চেয়ে দেখি তিনি উঠেছেন নিজেই। কিন্তু তাঁর নামবার কোন চেষ্টা বা ব্যস্ততা নেই। নিদ্রালু চোখদুটি মেলে প্লাটফর্মের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বললাম, 'কৈ আপনি নামলেন না? এইত হাজারীবাগ।'

তিনি যেন কেমন একটু উদাস দৃষ্টিতেই তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'না। থাক্‌গে। একেবারে বাবার চরণে গিয়েই পড়ি!···আমিও কাশী যাবো স্থির করলাম আপনার সঙ্গে।'

আমার মুখে কি কোন আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছিল? অথবা সে ভাব—গাড়ীর ঐ স্বল্পালোকে অতদূর থেকে তাঁর তন্দ্রাতুর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল? কে জানে।

তিনি একটু মুচ্‌কি হেসে বললেন, 'ভয় নেই। আমার জন্য বিব্রত হ'তে হবে না আপনাকে। আমার সেখানেই গুরুধাম। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আশ্রয় গুরুর আশ্রয়ই আছে। এমনি সঙ্গে যাবো।'

লজ্জিত হয়ে কি একটা বাজে জবাবদীহি করবার চেষ্টা করতে করতে চুপ ক'রে গেলাম।

ভৈরবী আর শুলেন না। আমারও ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না। তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে চেয়ে দেখলাম ভৈরবী এক ভাবে স্থির হয়ে বসে আছেন বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে।

এক হাতে ত্রিশূলটা তেমনি খাড়া ভাবে ধরা—আর একটা হাত নিজের গলায় ঝোলানো রুদ্রাক্ষের মালাটায়। জপ করছেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

গয়া এল ভোর পাঁচটায়। তখনও আব্ছা অন্ধকার। সর্দারজী কোলাহল করতে করতে মালপত্র নিয়ে নেমে গেলেন। এই খানেই তাঁর কারবার। যাবার সময় আমাদের দিকে চেয়ে স্মিতহাস্যে নমস্কার ক'রে যেতে ভুল হ'ল না তাঁর।

নেমে মুখে-হাতে জল দিয়ে চা খেলাম। মনে পড়ল ভৈরবীর পান খাওয়ার কথা। ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চা খাবেন?'

তিনি এত গোলমালেও কেমন একটু যেন আত্মস্থ হয়েছিলেন। আমার প্রশ্নে একটু চম্‌কেই উঠলেন যেন।

'চা? তা দিন বাবা। এটা হ'ল ব্রাহ্মমূহূর্ত। এখন খেলে দোষ নেই। বেলায় আর খাওয়া হবে না। যাচ্ছিই যখন, তখন মণিকর্ণিকায় একটা ডুব না দিয়ে—বাবার মাথায় জল না দিয়ে কিছু খাই কি ক'রে?'

চা নিয়ে অবশ্য ঝুলিতে হাত পুরলেন পয়সার জন্য, আমি সসঙ্কোচে নিরস্ত করলাম।

'আমাদের ত এই-ই অভ্যাস বাবা। পরের পয়সাতেই ত দিন কাটে।' মুচ্‌কি হাসলেন একটু।

মোগলসরাইতে নামতেই দেখি সামনে পাঞ্জাব মেল দাঁড়িয়ে। গাড়ীটা আজ আশ্চর্য-রকম খালি। আমার সঙ্গেও বিশেষ মাল ছিল না, ভৈরবীর ত এক ঝুলি ভরসা। দুজনে ধীরে সুস্থে গিয়ে সামনের একটা খালি গাড়ীতে উঠলাম। একেবারে খালি বেঞ্চি পেয়ে ভৈরবী পা ছড়িয়ে জুৎ ক'রে পান সাজতে বসলেন।

এতক্ষণ ধরে কৌতূহলটা মনকে খোঁচাচ্ছিল, নিরিবিলি পেয়ে সেইটেই বেরিয়ে এল, 'রাঁচিতে কোথায় যাচ্ছিলেন?' ভৈরবী চিলতে-করা পানের ওপর লঘুহস্তে চুনের প্রলেপ লাগাতে লাগাতে স্থির হয়ে গেলেন, কেমন একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকালেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'শুনবেন বাবা? এমন কিছু নয়। নিতান্তই ভেতরের কথা ব'লে একটু সঙ্কোচ হয় বলতে।'

তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বলি, 'থাকগে তবে। শুনেই বা কী হবে, আমারই অন্যায় কৌতূহল।'

'না-না—তেমন কিছু নয়। আসলে কি জানেন, রাঁচিতে আমার একটি আশ্রম ছিল। বছর-দুই ওখানে ছিলাম—তারই মধ্যে আমি আর স্বামীজি মিলে আশ্রমটি তৈরী করি। একটি মন্দিরও আছে রুদ্রেশ্বর মহাদেবের। আশ্রমের খরচ চালানোর জন্যে কিছু কিছু জমি-জিরাৎও জোগাড় করেছিলাম চেয়ে-চিন্তে। রাঁচি শহর থেকে মাইল চারেকের ভেতরেই, জমিজমা যা-কিছু—তাও সব ঐ কাছাকাছি। ভারি সুবিধে। এমন আশ্রম আরও আছে বাবা আমাদের। স্বামীজির শখই হল ঐ। আশ্রম করেন, ট্রাষ্টি ঠিক করেন, পূজারী এনে বসান—তারপর এক সময় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আর একটা নতুন জায়গায় এসে বসেন। তা এই রাঁচি আশ্রমটি বাবা আমারই শখের। বলতে গেলে ওর যা-কিছু সব আমিই করেছি। শিষ্যসেবকদের কাছ থেকে টাকা যোগাড়, মন্দির করানো, দেব-প্রতিষ্ঠা—মায় জমিজমা—সব। কাল খবর পেলাম, পুজুরী কেঁদে কেটে চিঠি লিখেছে, এক জমিদার কোথা থেকে এসে আমার আশ্রমের সব জমি খাস বলে দখল ক'রে নিয়েছে।

পুজুরীকে ওদিকে ঘেঁষতে পর্যন্ত দিচ্ছেনা। চিঠি পেয়ে স্বামীজিকে বললুম, চলো যাই। তিনি নির্বিকার। বললেন, কেন?…কেন কী গো। এর একটা বিহিত করবেনা? তিনি বললেন, পুজারীর ঐ জীবিকা, ট্রাষ্টিরা আছেন, সর্বোপরি বাবা রুদ্রেশ্বর আছেন। তাঁরা যদি কিছু না করেন—আমার কি গরজ? আমি ফেলে দেওয়া থুথু আর চাটি না। যা পেছনে ফেলে এসেছি তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই।…তিনি ত ঐ বলে খালাস, বাবা। আমার কিন্তু ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। যে ব্যাটা দখল করেছে তার ওখানে এক ছটাক জমি নাই, মন্দির হবার সময় সে একটা পয়সা দেয়নি। অমনি অমনি পরের জিনিস ভোগ করবে?…যত ভাবি তত মাথা গরম হয়ে যায়। রেগে বললুম, তবে তুমি থাকো—আমিই যাবো। বললেন, গিয়ে কি করবে? মামলা? আমি বললুম, আইন আদালত আমি বুঝি না—আমার এই ত্রিশূল আছে, একেবারে সোজা বাবা রুদ্রেশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দেবো—ব্যাটা যদি বেশি চালাকি করে! উনি শুধু হাসলেন একটু, বললেন, এই পোশাকেই যাবে না কি? আমি আরও রেগে গেলুম। এসব অবান্তর কথা ব'লে মনে হ'ল। একাই বেরিয়ে পড়লুম—তখ্‌খনি।'

'তারপর?' সাগ্রহে প্রশ্ন করি, 'তা হ'লে নাম্‌লেন না কেন?'

'কী জানেন বাবা, বেরিয়ে এসে পর্যন্ত ওঁর ঐ শেষের হাসিটা আর প্রশ্নটা কেবলই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। কেন ও কথাটা বল্‌লেন উনি, হাসিরই বা অর্থ কি? মনকে যত বোঝাই যে, ওটা নিহাৎই কথার কথা—ওটা কিছু নয়—কেমন যেন একটা অস্বস্তি হ'তে থাকে মনে মনে। শেষ পর্যন্ত জোর ক'রে ঘুমোলুম।

আমাদের ওসব একটু-আধটু অভ্যেস আছে বাবা, দরকার হ'লে একমাস না ঘুমিয়েও বেশ থাকতে পারি—আবার ইচ্ছে হ'লে এক মিনিটের মধ্যে যে কোন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তে পারি—কতকগুলো আসন আছে, খুব সহজ, যাতে স্নায়ুকে ইচ্ছাধীন ক'রে ফেলা যায়।—যাই হোক, ঘুম এল বটে ঠিক, কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ঐ স্বপ্ন দেখি, উনি যেন হেসে বল্‌ছেন, এই পোশাকেই যাবে নাকি? হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌লুম। ততক্ষণে জবাব পেয়ে গেছি মনে মনে—সত্যিই ত, এ যে সন্ন্যাসিনীর পোশাক। এখনও এত অধিকার-বোধ, সম্পত্তির ওপর এত মায়া—তাহ'লে সন্ন্যাস নেওয়ার অর্থ কি? এই পোশাক পরে যাবো বিষয়ের দখল নিতে? ছিঃ! মনে হ'ল যদি বাবা রুদ্রেশ্বরের ওপর বিশ্বাস থাকে ত তাঁর বিষয়ের ভার তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়াই উচিত। আর তা যদি না থাকে ত তাঁর নামে এ ভড়ং ক'রে বেড়াই কেন? তাঁর নামে এমন ক'রে পরের জমি নেওয়া ত আমার উচিত হয়নি তাহ'লে—আমিই ত অন্যায় দখল করেছিলাম! কথাটা মনে হ'তে বড় লজ্জা করতে লাগল। তাই আর নামলাম না। বরং মনে হ'ল মণিকর্ণিকায় ডুব দিয়ে, বাবাকে দর্শন ক'রে একটু প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যাই এই বিষয়-লালসার!'

চুপ ক'রে রইলাম। ভৈরবীর আঙ্গুলেও ইতিমধ্যে চুন শুকিয়ে উঠেছিল, তিনি আরও একটু স্থির হয়ে বসে থেকে নতুন ক'রে পান সাজায় মন দিলেন।

কথাটা হাল্‌কা ক'রে দেওয়া দরকার। কী বলি—ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বললাম, 'আচ্ছা, আপনি অত অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন কিন্তু হাতের ত্রিশূলটি ত ঠিক ছিল। সব

স্নায়ু শিথিল না হ'লে ঘুম আসে না শুনেছি—কিন্তু মুঠোটা অমন শক্ত রইল কি ক'রে ?'

তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'বহুদিনের অভ্যাসে অমন হয়েছে বাবা। তা নইলে কি পথে-ঘাটে একা মেয়েছেলে ঘুরে বেড়াতে পারি! স্বামীজি ত যখন যেখানে থাকেন বড় একটা নড়েন না —আমিই ঘুরে বেড়াই!'

ততক্ষণে গঙ্গার পোলে গাড়ী উঠেছে। চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠেছে অর্ধ্বচন্দ্রাকৃতি বারানসীর অপূর্ব দৃশ্য। ভৈরবী গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলেন—হয়ত বা বাবা বিশ্বনাথেরই উদ্দেশ্যে।

ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নেমে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কোথায় যাবেন ?'

'আমি এখন যাবো সোজা মনিকর্ণিকা—স্নান সেরে বাবাকে দর্শন ক'রে একসময় গুরুধামে গিয়ে উঠব।'

'গুরুধাম কোথায় আপনার ?'

'আউদগর্বিতে।'

আমিই একধার থেকে কৌতূহল প্রকাশ করে গেছি—উনি কিন্তু আমার সম্বন্ধে একটাও প্রশ্ন করেন নি। নিজের কাছেই এটা খারাপ লাগছিল বোধ হয়। তাই খাপছাড়া ভাবে নিজেই বলে ফেললাম, 'আমি যাবো ঐ ভেলুপুরায়, ওখানে আমার পিসীমা থাকেন।'

উনি শুধু বললেন, 'অ।···ঘাটেই দেখা হবে। কাশীতে ত আর দেখা হওয়ার অসুবিধে নেই।'

ওভারব্রীজ পেরিয়ে এসে রিক্সায় ওঠবার সময় আবার আমিই প্রশ্ন করলাম, 'ফিরবেন কবে কলকাতায় ?'

বিচিত্র ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন একটু। দৃষ্টিটা কেমন যেন করুণ বোধ হ'ল। বললেন, 'কে জানে কবে ফিরব। ফিরব কিনা তাই বা কে জানে। সব যেন ওলট্ পালট্ হয়ে গেছে ওঁর ঐ কথাটায়। আচ্ছা, আসি বাবা।'

একখানা রিক্সায় চেপে আমার আগেই তিনি রওনা হয়ে গেলেন।

অদৃষ্টের খেলা

অজয়ের জীবন দর্শন আর পাঁচটা মানুষ থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে বলত, "silly goat"দের মত শুধু দিনরাত টাকার পেছনে ঘুরে বেড়িয়েই যদি জীবনটা কেটে গেল ত' জীবনে ভোগ করলে কি?"

তার উত্তরে হয়ত উত্ত্যক্ত হয়ে বন্ধু জগদীশ বা পচা এক একদিন বলে ফেলত, 'তুই ত একটা পর্যন্ত ঘুমোস প্রত্যহ—তারপরও নড়তে চাসনা কোথাও, তুই-ই বা জীবনটা কি ভোগ করলি?'

"যার যা ভোগ করার আইডিয়া দাদা—ছুটোছুটি ক'রে বেড়ালেই কি হ'ল? যে দেখতে জানে সে ঘরে বসেই দুনিয়া দেখে, তোদেরই ত রবিঠাকুর বলে গেছে—বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ ঘুরে—কী যেন?···দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু, দেখা হয় নাই নয়ন মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু।"

"রবিঠাকুর থাক। অন্তত ওঁকে তুই বাদ দে।" নিরস কণ্ঠে পচা বলে।

অজয়ের মামা রায় সাহেব হরিহর মুখুজ্জে ধনী ব্যক্তি। কাজকর্ম কিছুই করেন না—করতে হয় না। স্ত্রী নেই—সুতরাং বই এবং গড়গড়া ভরসা। ইদানীং একটা নতুন উপসর্গ জুটেছে, বই লেখার বাতিক। দশবছর ধরে তিনশ পৃষ্ঠার বই লিখেছেন—"বাংলার জাতীয় জীবনে কীট-পতঙ্গাদি ইতর প্রাণীর প্রভাব।" সেইটে ছাপা নিয়ে তিনি সম্প্রতি কয়েক মাস ব্যস্ত। সংসার কিছুই দেখেন না—তাঁর বিশ্বাস তাঁর ভাগ্নে অজয় সে কর্তব্যটা করে।

কিন্তু অজয়ের বয়স যতই কম হোক, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কম নয়। সে জানে যে—ঝি-চাকর নিয়ে যখন কারবার তখন চুরি বন্ধ করা যাবে না, তার চেয়ে ওদের সঙ্গে একটা রফা ক'রে নেওয়াই ভাল। সে প্রকারান্তরে ওদের বলেই দিয়েছে যে, "তোমাদের ওপর নজর রাখতে চাই না, মোদ্দা আমার আর মামার দিকটায় তোমরা একটু নজর রেখো। আর পুকুর চুরিটা করো না—।"

তা তারা নজর রাখে। বেশি ক'রে যত্ন করে অজয়কেই, কারণ তাকে হাতে না রাখলে বিপদের সম্ভাবনা। ফলে অজয় নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব জীবন যাপন করে। ঘুম ভাঙে তার কোনদিন এগারোটায়, কোনদিন বা বারোটায়। তারপর কাপ-তিনেক চা ও জলখাবার খেয়ে স্নান করতে যায় চারটেয়। পাঁচটায় ভাত খেয়ে দিবানিদ্রা দেয় ঘণ্টাখানেক। তারপর একটু বেরোয়। কোন-দিন সিনেমায় যায়, কোনদিন বা পচুর বৈঠকখানায় গিয়ে আড্ডা জমায়। পচা নতুন উকীল—নেহাৎ শ্বশুরের জোর থাকায় দু একজন মক্কেল আসে মধ্যে মধ্যে। তবু আড্ডার অসুবিধা হয় না। ওখান থেকে ফিরে রাত্রির আহার সারে সে রাত বারোটার মধ্যেই। তারপর দুটো-তিনটে পর্যন্ত বই পড়ে ঘুমোতে যায়। এই হ'ল ওর জীবনের বাঁধা নিস্তরঙ্গ রুটিন।

জগদীশ বলে, "কুড়ের বাদশা।"

অজয় বলে, "শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলতে পারো। এই কুঁড়েমীই আমার জীবনদর্শন।"

জগদীশ চটে গিয়ে বলে, "খুব দর্শন। যে দেশে লোক উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে এক বেলা খেতে পায় না—সেই দেশে এই কুঁড়েমী—এ ত ক্রিমিন্যাল অফেন্স।"

অজয় বলে, "তুই আইন পড়েছিস পচা কিন্তু লজিক জানিসনে। যে দেশে লোকে উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রেও এক বেলা খেতে পায়না, সে দেশে আমি যদি আরও খানিকটা পরিশ্রম করি তাহ'লে তাদের ভাত আরও কি কম পড়বে না। বড় লোক হয় গরীবকে মেরেই—এটা ত বিশ্বাস করিস?···মামা একগাদা টাকা জমিয়ে রেখেছে, তার ওপর আমিও যদি আর খানিকটা জমাই, গরীব-দের কি উপকারে আসবে বলতে পারিস। বরং একজায়গায় স্ট্যাগ্‌নেটেড হয়ে যাবে। তার চেয়ে মামা মরে গেলে সে টাকাটা আমি দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় উৎসর্গ করব, সেটা ভাল হবে না?"

"ও, দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় উৎসর্গ করবে? সাধু সংকল্প। কিভাবে সেটা হবে?"

"কেন দুহাতে ওড়াব! তাহলেই দেশবাসীর টাকা দেশবাসীর কাছে চলে যাবে!"

"দ্যাখ—এসব কথা নিয়ে এমন মর্মান্তিক পরিহাস করিস নি। কী কষ্ট করতে হয় আমাদের এক মুষ্টি অন্নের জন্যে—"

"তা করতে হয়। সে ভাই আমি খুব মানছি। বিশেষত তোকে একমুষ্টি অন্নের জন্য শ্বশুর-কন্যা তথা শ্বশুরের যে ভাবে মন-জোগাতে হয়, সে বড় কম নয়। আমি ত ভাই পারতুম না! কবে শ্বশুর একটা মক্কেল দেবে তার জন্যে হা-পিত্যেশ বসে থাকা—। তবে হ্যাঁ, কষ্টের কথা যদি বললি, আমিই কি কম কষ্ট করছি!"

রাগে বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হ'লেও জগদীশের শেষ পর্যন্ত কৌতূহলই প্রবল হয়। অনিচ্ছাতেও বলে ফেলে, "কি রকম?"

"দ্যাখ—টাকা রোজগারের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। এর

চেয়ে তীব্র বাসনা মানুষের আর কিছুই থাকতে পারে না। সেই প্রবৃত্তিকে আমি কি কষ্টে দমন ক'রে বসে আছি বল দিকি? ইচ্ছে করলেই, মামার পয়সায় ব্যবসা ক'রে বড় লোক হতে পারি। কিন্তু পাছে দেশের দরিদ্র নিপীড়িত জনসাধারণকে বঞ্চিত করতে হয় এই ভয়ে—"

জগদীশ রাগ ক'রে বলে, "তুই সহজে বাড়ী যাবি, না ছাতা-পেটা করতে হবে?"

"দাদা, সব ফিলজফির সেরা ওটা। তা মানতেই হবে। বাহুবলের কাছে আর কিছুই নেই। অগত্যা উঠি। পৃথিবীতে ভাল কথা কি কোথাও বলবার জো আছে! শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।"

কিন্তু তাছাড়াও বিঘ্ন ঢের। একদিন এতটুকু অসতর্কতায় একটা অঘটন ঘটে গেল। মামা প্রুফ দেখতে গিয়ে কী একটা নতুন বানানে ঠেকে গেলেন। হাতের কাছে চলন্তিকা নেই। টেলিফোন করতে গিয়ে দেখেন টেলিফোন খারাপ। তখন চললেন অজয়ের খোঁজে। এখনই যদি গিয়ে কোথাও থেকে অভিধানটা কিনে আনতে পারে।

ও হরি। এ কি! ওর যে দোর বন্ধ।

চাকর অবিনাশকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, "হ্যাঁরে অবে, অজয়ের দোর বন্ধ কেন?"

"আজ্ঞে দাদাবাবু ঘুমুচ্ছেন!"

"এরই মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছে? তা দিনের বে-লায় ঘুম—দোর বন্ধ করে কেন? ছেলে-পিলে নেই যে ব্যাঘাত ঘটাবে—"

"আজ্ঞে এটা ওনার আত্তিরের ঘুম!"

"রাত্তিরের ঘুম! তার মানে বলতে চাস—এখনও ও ওঠে নি।"

"আজ্ঞে না।"

হরিহর ঘড়ির দিকে তাকালেন, একটা বাজতে দশ!

ঈষৎ ব্যাকুলকণ্ঠেই বললেন, "আর তোরা এখনও ডাকিস নি, কি আমায় খবর দিস নি? অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যায়নি ত? কাল কি অসুখ-বিসুখের কথা কিছু বলেছিল? মানে শরীর খারাপ টারাপ?"

"আজ্ঞে না।"

"তাহ'লেও এতক্ষণ একটা খোঁজ করা উচিত ছিল। ডাক ডাক —দরজায় ঘা দে—"

হরিহর ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অবিনাশ কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন!

"আজ্ঞে ডাকলে উনি আগ করেন যে!"

"রাগ করেন? তার মানে? রোজই এমনি ঘুমোয় নাকি হতভাগা—?"

"আজ্ঞে তা পেরায় দিনই—"

"এই একটা পর্যন্ত?"

"কোনদিন এগারোটা, কোন দিন বা একটা, যিদিন যেমন!"

হরিহর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে দুমদুম ক'রে দরজায় ঘা দেন "অজয় অজয়! এই হারামজাদা—"

অজয় চমকে উঠে শশব্যস্তে বেরিয়ে আসে "মামা, ডাকছেন?"

"মামা ডাকছেন? বাঁদর, গাধা কমনেকার। এত বড় ছেলে হয়েছেন এক পয়সা রোজগারের চেষ্টা নেই—বেলা একটা পর্যন্ত ঘুম! একেবারে এতদূর অধঃপাতে গিয়েছ? এমন হয়েছে আমাকে

কেউ বলেওনি। আশ্চর্য।"

আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় অজয় হতভম্ব হয়ে গেছে। তাছাড়া মামা কোন দিনই এদিকে আসেন না। এ একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সে আমতা আমতা ক'রে বলে, "না মানে এই—।"

"বুঝেছি। আরও এক ঝুড়ি মিছেকথা বলতে হবে—এইত! শোন্, আমি মনস্থির করেছি। আসছে মাসের প্রথমেই যে দিন আছে সেই দিনই তোর বিয়ে দেব—"

"বিয়ে?" অজয় আকাশ থেকে পড়ে। তাছাড়া বেলা পর্যন্ত ঘুমোবার সঙ্গে বিবাহের যোগাযোগটা ঠিক বুঝতে পারে না।

"হ্যাঁ হ্যাঁ—বিয়ে। কেন, কথাটা কি কখনও শোন নি, না কি?…না বিয়ের বয়স তোমার হয় নি?" ঈষৎ বিদ্রূপ করেই বলেন মামা।

"না, তা নয় তবে—।"

"তবে কিরে হতভাগা? তবে কি? আমি বলছি বিয়ে, ব্যাস্ বিয়ে। করতেই হবে। ঘাড়ে চাপ না পড়লে রেস্‌পন্‌-সিবিলিটি জ্ঞান হবে না, আর তা না হলে কাজকর্ম কোনদিনই কিছু করবে না। যত লক্ষীছাড়া ছ্যাব্‌লা ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে বেড়ানো তোমার বন্ধ করতে হবে একেবারে। ওতে জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়।"

"কিন্তু মামা—আপনি—"

"চোপরাও! আমি বলছি, আবার তার ওপর কথা কি রে? বলছি বিয়ে করতে হবে—করবি। বাপের সুপুত্তুর হয়ে সুড়সুড় ক'রে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসবি। মেয়েও আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি। খাসা মেয়ে।"

অজয় বোকার মত তাকিয়ে থাকে। এত দ্রুত অগ্রসর হওয়া তার বুদ্ধির অগম্য।

"ভাবছিস মেয়ে পেলুম কোথা? সব আছে, শুধু মাথাটা খাটালেই হয়। ব্রেণটা হ'ল একটা পিজন-হোল—খোপে-খোপে সব তোলা আছে। এই মনে হচ্ছে কিছু মনে নেই, ঠিক খোপ-টিতে হাত দাও—একেবারে হুড় হুড় ক'রে সব বেরিয়ে আসবে, with reference to the context! তবে হ্যাঁ, আমার মত মেথডিক্যাল হওয়া চাই। ঠিক মত সাজিয়ে রাখবে, ঠিকমত বার করবে। যেমন মন স্থির করলুম বিয়ে, অমনি ব্রেণকে রেফার করলুম, মেয়ে? মেয়ে কৈ? ব্রেণ জিজ্ঞাসা করলে—কী রকম মেয়ে চাই! বললুম, খুব শক্ত মেয়ে—বেরিয়ে এল রেকর্ডিং ফাইল থেকে। আমারই বন্ধু আছেন। প্রফেসার ফণী রায়ের মেয়ে—অম্বালিকা। এম-এ পাস মেয়ে, একটা বইও লিখেছে "ভারতের জাতীয় জীবনে অ-ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রভাব ও ভাব-সঙ্ঘর্ষ।" খাসা বই। পড়িনি, কিন্তু বইয়ের নাম শুনেই মনে হচ্ছে ভাল বই!"

অজয়ের গলা দিয়ে কাতর স্বর বেরোল, অর্ধস্ফুট কণ্ঠে ব'লে উঠল—"ও বাবা!"

সেটাকে প্রশংসাসূচক কিছু ধরে নিয়ে বিজয়-গর্বে হরিহর বললেন, "বোঝ বাবা! হরিহর মুখুজ্জে সোজা ছেলে নয়। সব রেডি। আমি এখনই গিয়ে ফণীকে টেলিফোন করছি। আজই বরং মেয়েটাকে নিয়ে আসুক একবার সন্ধ্যাবেলা। আর আমি বইটা পাঠিয়ে দিচ্ছি অবেকে দিয়ে—একটু নেড়েচেড়ে ত্যাখ্।"

বাদানুবাদের অবসর মাত্র না দিয়ে রায়সাহেব ব্যস্তভাবে চলে গেলেন।

অজয়ের আর কোন কাজেই উৎসাহ রইল না। এমন কি চা-ও যেন বিস্বাদ লাগল মুখে। এ কী দুর্দৈব। কোথাও কিছু নেই, বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বিয়ের খবর! তাও কি না এম-এ পাস মেয়েকে। এম-এ পাসেও আপত্তি নেই কিন্তু যে মেয়ে ঐ কিম্ভূতকিমাকার নামের বই লিখতে পারে—তার সঙ্গে আজীবন কাটাতে হবে? সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠল অজয়ের কথাটা ভাবতেই।

একটু পরেই অবিনাশ বইখানা দিয়ে গেল। বেশ মোটা-সোটা ভারী বই। ছোট অক্ষরে ঠাস-ছাপা। আর তেম্‌নি কি অসংখ্য কোটেশ্যান্‌। অজয় বেশ চেঁচিয়েই বলে উঠ্‌ল, "কী জ্যাঠা মেয়ে রে বাবা!"

অবিনাশ বললে, "আজ্ঞে?"

"কিছু না—তুই যা। আজ আর আমি কিছু খাবো না—ঠাকুরকে বলে দিগে যা—"

"আপনি খাবে না কিছু? কেন দাদাবাবু?"

"খাবো না—আমার খুশী। তুই যা দিকি। দিক্‌ করিসনি মেলা।"

"আর যদি বড় বাবু শুধোয়?"

"বলবি যে মরে গেছে দাদাবাবু। নইলে বলিস বরং শ্বশুর বাড়ী গেছে—"

অবিনাশ চলে গেলে অজয় বইয়ের মধ্যে থেকে একটা পাতা খুলে ফেললে—কিন্তু চোখে যা পড়ল তাতে বুক শুকিয়ে গেল। উঠে তাড়াতাড়ি ক'রে গিয়ে পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে ফেলে

তবে সুস্থ হল খানিকটা।

সন্ধ্যার আগেই ফণী রায় মেয়েকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন। বরং বলা যায় অম্বালিকাই তার বাপকে সঙ্গে ক'রে এল। লম্বা চেহারা, টক্ টক্ ক'রে চলে, কাটা কাটা কথা বলে; একেবারে মেম-সাহেবী মেজাজ!

তাকে দেখেই অজয় আর একটা অর্ধ-স্বগতোক্তি করলে, "ও বাবা!"

কিন্তু অম্বালিকা বেশ স্বপ্রতিভ।

কাছে এসে হাত তুলে একটু নমস্কারের ভঙ্গী করে বললে, "কাকাবাবু টেলিফোনে আমাকে সব কথাই বলেছেন। তা আমার আপত্তি নেই বিশেষ। আমিও এমনি একটি পাত্রই খুঁজছিলুম—আত্মিক প্রভাবের দ্বারা স্ত্রীরা স্বামীকে নিজেদের মত ক'রে গড়ে নিতে পারে কি না এই একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট করব—আমার অনেকদিনের ইচ্ছা। আপনার বিবরণ শুনে মনে হ'ল আপনি সেদিক দিয়ে আইডিয়াল একেবারে। ভদ্রবংশে জন্ম, খাওয়া পরার জন্য খাটতে হয় না ব'লে অলস এবং আরামপ্রিয়, অথচ নিরীহ। এমনিই দরকার। কাকাবাবুকে আমি ব'লে দিয়েছি, দ্দি সুনার দি বেটার। সবটা যখন গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে, তখন মিছামিছি সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই।"

"ও বাবা!" কাতর ভাবে চায় অজয়, "আজ্ঞে আমাকে দিয়ে কি সুবিধে হবে আপনার?"

"তবে এতক্ষণ এত কথা বললুম কি? এক কথা একশ বার বললে এনার্জি নষ্ট হয়। হ্যাঁ, তবে শুনুন—আপনাকে ইতিমধ্যে তৈরী হ'তে হবে খানিকটা—রোজ ছটায় উঠবেন, আরও ভোরে

ওঠা উচিত কিন্তু প্রথমেই অতটা পেরে উঠবেন না ত! ছটায় উঠবেন, আমি কাকাবাবুকে বলে দিয়েছি একটা এলার্ম ঘড়ি কিন্‌তে, চাকরদেরও ধম্‌কে দিয়ে যাবো যাতে ঠিক সময় ডেকে দেয়। মিনিট পনের ব্যায়াম ক'রে নেবেন—হ্যাঁ ব্যায়াম,—ওটা চাই। তারপর দশটায় স্নান করে খেয়ে নেবেন, তার পরে ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনো করবেন। অবশ্য কাকাবাবুর মানে আপনার মামার লাইব্রেরীও মন্দ নয়। হাউএভার, চারটে পর্যন্ত পড়বেন। বিকেলে একটু বেড়াবেন। দেড় ঘণ্টার বেশী আড্ডা আমি এলাউ করব না। তাছাড়া রোজ আমার ঐ বইটা এক চ্যাপ্টার ক'রে পড়বেন। লাইফটা যে সীরিয়াস জিনিস সে সম্বন্ধে ও থেকেই একটা আব্‌ছা জ্ঞান পাবেন, আর কিছু বুঝুন বা না বুঝুন। আপাতত এই থাক্—বাকী যা ডিটেল্‌ড্ প্রোগ্রাম আমি এসে ক'রে দেব, বিয়ের পর। চলো বাবা—"

ফণীরায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাহলে বাবাজী কাল আমাদের ওখানেই বৈকালিক চা-টা খেও। রেখার গর্ভধারিণী একবার দেখতেও পাবেন তাহলে—"

"রেখা?' বিস্মিত অজয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় কথাটা।

অম্বালিকা বাবার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিলে, "ওঁরা আমার নাম রাখেন রেখা। সে নাম আমিই পাল্‌টে নিয়েছি। সিলি নাক ওসব। অম্বালিকা নামের মধ্যে একটা স্ট্রেন্‌থ্ আছে—তাই না? তাছাড়া ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে কোথায় যেন একটা কি সম্পর্ক আছে! অম্বিকই রাখবো ভেবেছিলুম কিন্তু আমাদের কলেজের কেরাণী ছিল অম্বিকে চক্রবর্তী—তাই ওটা পছন্দ হ'ল না। এসো বাবা।"

রাত্রে জগদীশের অফিস ঘরে গিয়ে যখন ঝুপ ক'রে বসে পড়ল অজয়, তখন ওর মুখের চেহারা দেখে চম্‌কে উঠল সে।

"কী হয়েছে রে? অমন শুকিয়ে উঠলি কি ক'রে একদিনে? মুখ যে কালি হয়ে গেছে!"

"আর কি হয়েছে। কি হ'তে বাকী আছে তাই বল!"

অজয় সব কথা খুলে বলে।

"বেশ ত মন্দ কি? এম-এ পাস মেয়ে রোজগার ক'রে খাওয়াতে পারবে। দেখতেও মন্দ নয় বলছিস্।"

"ওরে বাবা—দেখিস নি তাই বলছিস। ওর চেয়ে রেসের ঘোড়াকে বিয়ে করা ঢের সোজা। তারাও ত রোজগার ক'রে খাওয়ায়। সে ত মেয়ে নয়—মানোয়ারী গোরা!"

"কেন—কেন হ'ল কি। বিয়ের আগে আইবুড়ো মেয়েদের অমন অনেক ভিরকুটি দেখা যায়!"

"সে রকম মেয়ে নয় বাবা—এই বই লিখতে পারে সে মেয়ে স্বামীকে আর্ধেক রাতে খুন করবে এই আমি বলে দিলুম। শুনবি কি লিখেছে—?"

অজয় বইয়ের একটা জায়গা খুলে পড়তে শুরু করে, "আত্মার বাহ্যিক সত্তা স্বভাবতই জড়-চৈতন্যের বশীভূত। সে জন্য পণ্ডিতেরা যাহাকে খণ্ড-চৈতন্য বলিয়াছেন তাহাকে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়া তাহার প্রভাবের উর্দ্ধে ওঠাই মানবের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এতদুদ্দেশে মহর্ষি চার্বাক যাহা বলেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য—।"

"চুপ কর চুপ কর—আমার পেট গুলিয়ে উঠেছে।" ব্যাকুল কণ্ঠে জগদীশ ব'লে ওঠে।

"তবে!" যেন একরকম বিজয় গর্বে বলে অজয়, "খুব যে সৎপরামর্শ দিচ্ছিলি! নে বে কর, এই মেয়েকে।"

"তাইত! কী করা যায় এখন?" চিন্তিত কণ্ঠে বলে জগদীশ।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। অজয় খুবই ম্রিয়মান। খানিক পরে জগদীশ লাফিয়ে ওঠে—"হয়েছে। প্ল্যান খেলেছে মাথায়।"

"কী রকম, কী রকম?"

"শোন্ তাহ'লে বলি," গলাটা নামিয়ে পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলে জগদীশ, "তোকে পাগলের ভান করতে হবে।"

"পাগল?"

"হ্যাঁ—ওসব লেখাপড়া জানা মেয়ে, ওরা মাতালকে তত ভয় করে না, যত করে পাগলকে।"

"তারপর? মামা যদি ধরে পাগলা-গারদে দেয়?

"তত পাগলামি করবি কেন? এমন একটু আধটু করবি যাতে মেয়েটা ভয় পেয়ে যায়—অথচ তুই মামার কাছে স্রেফ্ উড়িয়ে দিতে পারিস—"

"তাইত। তুই যে আবার বেশী ক'রে ভাবিয়ে দিলি! দেখি—" অজয় চিন্তিতমুখেই উঠে দাঁড়ায়।

"বোস বোস—প্যাঁজের বড়া খাবি না? বৌ ভাজছে।"

"স্ত্রীলোকের হাতের কোন জিনিস আমি স্পর্শ করব না। আমি সন্ন্যাসী হবো।" মুখটা গোঁজ ক'রে অজয় বেরিয়ে যায়।

ফণী রায়ের বাড়ী বালিগঞ্জে। বেশ একটু ফাঁকার ওপরেই। বাগানও আছে খানিকটা।

অম্বালিকা একটু ফাঁক পেয়েই অজয়কে বাগানে টেনে নিয়ে যায়—"শুনুন, একটু কথা আছে।"

যতটা সম্ভব বোকা বোকা মুখ ক'রে চায় অজয়। একটু হাসেও হি-হি ক'রে—

"ও কি এখনই অত হাসি কেন। বিয়ে ত হয়নি।" ব'লে ফেলেই অম্বালিকা গম্ভীর হয়।

"কটায় উঠেছেন আজ?"

"ঘুম ভেঙ্গেছে ছটায়, মামার চীৎকারে। তাই শয্যাত্যাগ করতে হয়েছে সকাল সকাল। সাড়ে আটটার মধ্যেই।"

"ওকি। সব মাটি! ব্যায়াম করেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কী কী করলেন।"

"নীচে নেমেছি ধরুন বার দুই, উঠতেও হয়েছে একবার। তারপর ধরুন বাথরুমে যাওয়া, দুবার মামার কাছে যাওয়া—"

"সিলি! ওতে কখনও ব্যায়াম হয়? পনেরো মিনিট ধরে ফ্রি হ্যাণ্ড, জার্কস্। আচ্ছা, আমি বই পাঠিয়ে দেব। আমার বইটা পড়েছেন?"

"বড্ড ব্যথা হয়েছে দাঁতে। দুদিন যাক্—"

"দাঁতের ব্যথার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক?"

"বড্ড শক্ত যে। এর পর ঐ বই পড়তে গেলে একটা দাঁতও থাক্‌ত না।"

"ননসেন্স। আবার ঠাট্টা। ওসব চলবে না। আমি ওসব অর্থহীন ঠাট্টা-তামাসা পছন্দ করি না। বিয়ের পরে আরও সোবার হতে হবে আপনাকে। বিয়ে হলেই যে স্ত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা করতে

হবে এমন কোন মানে নেই।"

"অ। আচ্ছা।" ভাল মানুষের মত সায় দেয় অজয়।

"হ্যাঁ। আপনাকে দেখছি আরও কড়া হাতে কণ্ট্রোল করতে হবে।"

"ও বাবা!"

"চলুন। বাবা বোধহয় এতক্ষণে খুঁজছেন আমাদের। চা আমাদের ষ্ট্রিক্‌ট্‌লি য়্যাট্‌ ফাইভ খাওয়া হয়।"

"চলুন।" যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় অজয়—"শুনুন একটা কথা।"

"কী আবার? বলুন, বলুন। বেয়ারলি আর পাঁচ মিনিট সময় আছে।"

কাছে এসে গলাটা একটু নামিয়ে অজয় বলে, "আপনাকে আমার একটা খুব বড় দেখে চাঁটি মারতে ইচ্ছে করছে।"

"তার মানে? পাগল নাকি আপনি।" কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে অম্বালিকার।

হি হি করে হাসে অজয় খানিকটা। তারপর বলে, "নিদেন কানটায় একটা কামড় দিই না?"

"মাই গড্‌। বাবা—ও বাবা—" তিন লাফে অম্বালিকা ভেতরে চলে যায়।

রাত্রে হরিহর অজয়কে ডেকে পাঠান, "এর মানে কি?

"কী মামা?"

টেবিলে প্রকাণ্ড একটা চড় মেরে হরিহর বলেন, "এর মানে কি তাই আমি জানতে চাই। কী সব বাঁদরামি ক'রে এসেছিস্‌

সেখানে !”

“কৈ—কিছু ত মনে পড়ছে না মামা।” শান্ত ও সরল ভাবেই বলে অজয়।

“তুই নাকি মেয়েটাকে কামড়ে দিতে গিয়েছিলি ?”

“আমি ? মেয়েটাকে ? মানে ঐ কনেকে। তাই কি কখনও সম্ভব মামা ? এমনি মিছে কথা বলে নাকি মেয়েটা ? এধারে ত খুব গম্ভীর। তাহ’লে ত দেখছি মুস্কিলের ব্যাপার।”

“হুঁ ! মিছে কথা কে বলছে তার ঠিক কি ? ফণী ফোন করছিল এই মাত্র। তার বিশ্বাস তোর মাথা খারাপ আছে। আমি অবিশ্যি ছ্যার ছ্যার ক’রে খুব শুনিয়ে দিয়েছি খানিকটা। আমাকে বলে ফ্যামিলিতে পাগলামির ইতিহাস আছে কিনা। আমাকে ! কি সাহস !……হাউএভার—তার চ্যালেঞ্জও আমি য়্যাক্‌সেপ্ট করেছি—কে ওর শালা আছে ডাক্তার, সে নাকি এই সবই দেখে—তাকে পাঠাবে কাল বিকেল চারটেয় তোর সঙ্গে আলাপ ক’রে যাবে। খুব সাবধান, বেশ ভদ্রভাবে বিহেভ্‌ করবি।”

পরের দিন ঠিক বেলা চারটের সময় ডাক্তার ব্যানার্জি এলেন, কাঁটায় কাঁটায় চলেন তিনি—পাক্কা সাহেব। ঘরে ঢুকেই বললেন, “তবু ত্রিশ সেকেণ্ড লেট হয়ে গেল। গাড়ীর সামনে একটা ষাঁড় পড়েছিল কিনা।”

অজয় স্মিতহাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো। ডাক্তার বসে পড়ে একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, “তারপর কেমন আছেন আপনি ? আচ্ছা, আপনার মধ্যে মধ্যে কি অমনি ইচ্ছা করে নাকি ? কাউকে কামড়াতে ?”

“কৈ না ত !”

"না—দেখুন স্যানিটি আর ইন্‌স্যানিটির মধ্যে লাইনটা এত সূক্ষ্ম! আমরা ত এই কাজই করছি কিনা দিনরাত। কোথায় যে কার কী স্ক্রু ঢিলে থাকে! দেখুননা, কত লোক অনায়াসে বাঘ মেরে আসছে জঙ্গলে গিয়ে, অথচ হয়ত একটা মাকড়শা দেখলে মুর্ছা যায়। এমনি আপনি বেশ আছেন—কিন্তু মুখের কাছে কারুর কান দেখলেই কামড়াতে ইচ্ছে করে। আজকাল পারফেক্টলি সেন্ মানুষ পাওয়াই শক্ত। কোথাও না কোথাও একটু ঢিলে আছেই। আমরা ত মশাই এই নিয়েই নাড়া চাড়া করছি। এক এক সময় মনে হয় আমরা এই দু-চার জন মানসিক ব্যাধির ডাক্তার ছাড়া প্রকৃতিস্থ লোক কোথাও আছে কিনা সন্দেহ!"

"আজ্ঞে, তাহ'লে আর অত মাথাই বা ঘামাচ্ছেন কেন?"

"না, তবু। ওরই মধ্যে—একটু বেছে নিতে হবে বৈ কি! ওটা হেরিডেটরী হ'লেই মুস্কিল। এমনি আপনার নার্ভস্ কেমন?"

"ভালই—এই দেখুন না," প্রশান্ত মুখে অজয় পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা জ্যান্ত টিকটিকি বার করে—"এই ত আমি এ জন্তু-টাকে কত সহজে ধরে রয়েছি, আমার নার্ভ ত একটুও বিচলিত হচ্ছে না, অথচ যদি আপনার জামার মধ্যে ছেড়ে দিই—"বলতে বলতেই ওঁর ওয়েস্ট কোটের মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দেয় অজয়।

"আঁ—আঁ" ক'রে চেঁচিয়ে লাফিয়ে যেন ছিটকে ওঠেন ডাক্তার ব্যানার্জী। যেন নেচে নেন একপাক।

"ননসেন্স, এবোমিনেব্‌ল্, হি ইজ এ ম্যাডম্যান, য়্যাজ ম্যাড্ য়্যাজ হ্যাটার!"

বলতে বলতে সোজা গিয়ে ঢোকেন হরিহরের লাইব্রেরী ঘরে।

অজয় মনে মনে ধন্যবাদ দেয় বন্ধু জগদীশকে। টিকটিকি

দেখলে ডাক্তার ক্ষেপে যান এ খবরটা জগদীশই দিয়েছিল ওকে।

কিন্তু অম্বালিকার হাত থেকে অব্যাহতি পেলেও এদিকে ফল শুভ হ'ল না। হরিহর রেগে মুখ লাল ক'রে এসে অজস্র গালাগালি দিয়ে বললেন, "তুই আমার নাম ডুবিয়েছিস্, আমার গালে চুন-কালি দিয়েছিস্। ···তোর মুখ দেখাও পাপ। দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতুম। নিহাৎ জান্নু মরবার সময় তোর ভার দিয়ে গিয়েছিলো বলেই এবারও মাপ করলুম। কিন্তু এক সর্তে। তিন মাস সময় দিলুম—এর মধ্যে হয় কিছু রোজগার ক'রে প্রমাণ করবি তোর যোগ্যতা, নইলে একটি সৎ আর ভদ্রবংশের মেয়ে দেখে বিয়ে করবি। বাস্, আমার যে কথা সেই কাজ—তা ত জানিসই !"

অজয়ের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। চাকরী করার মত লেখাপড়া সে শিখেছে। কিন্তু সে মেজাজ ওর নয়। অফিসে গিয়ে দশটা পাঁচটা বসা অসম্ভব।

পচু বললে, "তবে বিয়েই কর। সে ঢের সোজা।"

"দূর বোকা। তুই কিছু জানিস না। সে আরও ঢের হাঙ্গামা। তাছাড়া তখন প্রাণের দায়ে যেমন ক'রে হোক টাকা রোজগার করতে হবে। হয়ত বা চাক্‌রীই করতে হবে শেষ পর্যন্ত। মামা-ব্যাটা সেই ফাঁদেই জড়াতে চায় দেখছিস্ না।"

"তবে ?"

"টাকা থাকলে ব্যবসা করতুম।"

"পারতিস ?"

"খুব। ও আর এমন কি হাঙ্গামা। কিন্তু টাকাই নেই যে। এমন হবে জানলে কি মামার টাকাই কিছু ঝেড়ে রাখতে পার-

তুম না। তখন গা-ই করিনি। হাত-খরচ বলেও কিছু নিইনি কখনও। জানতুম যে যখন যা চাইব তা ত পাবই!"

"এখন?"

"না—এখন আর চাওয়া যায় না। প্রেষ্টিজে বাধে।"

"ব্যবসা করব বললেও দেবেনা?"

"সেত নয়ই। মামা বলে ব্যবসার তুই জানিস কি? ওকালতি শিখতে হয়, ডাক্তারি শিখতে হয় আর ব্যবসার কিছু শেখার নেই? সব বৃত্তিরই খানিকটা শিক্ষা আছে।

"তা নেহাৎ মন্দ বলেনি—যাই বলিস।" প্রশংসার সুরেই বলে জগদীশ।

"কিন্তু তাতে আমার সুবিধে কি বলতে পারিস? আমি এখন কি করি?"

চিন্তিত কণ্ঠে জগদীশ বলে, "আর ত কোন পথ দেখি না। এক উপায় আছে, বীরেন চাটুয্যের রোল্‌স্-এর তলায় পড়া।"

হঠাৎ যেন লাফিয়ে ওঠে অজয়, "ঠিক বলেছিস্—কেল্লা মার দিয়া। একখানা ভাঙ্গা গাড়ী সস্তায় দেখতে পারিস? কিছু খরচ ক'রে দুচার দিনের জন্য চলনসই ক'রে নেওয়া যায়?"

"কেন বল্‌ত?"

"বলছি। মোটরের নিচে পড়াটা সেকেলে হয়ে গেছে। অন্য একটা মতলব ভেঁজেছি। শোন্ তবে—"

অনেক রাত পর্যন্ত দুজনে পরামর্শ করে। জগদীশের বাড়ীর পাশেই এক হিন্দুস্তানী গোয়ালা একশ' টাকায় একটা ভাঙ্গা গাড়ী কিনে রেখেছিল। সে সেটা পাঁচ-ছ দিনের জন্য হাতছাড়া করতে রাজী হ'ল। কথা হল যে এখন এরা গাড়ীটা সারিয়ে রং

করিয়ে নেবে এবং চলনসইও করবে। সে খরচা এদের। কিন্তু কথা রইল যদি কোন য়্যাক্সিডেন্টে গাড়ী জখম হয় ত তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ করতে হবে না। সে বাবদ পঞ্চাশ টাকা তাকে একেবারে অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হ'ল।

গাড়ী মেরামত করতে আর দিন-তিনেক সময় লাগল। তার-পর একদিন কোন মতে সেটা নিয়ে ভোর বেলা অজয় বেরিয়ে পড়ল লেকের দিকে। প্রতিদিন ভোরবেলা পাঁচটার সময় স্যার বীরেনের একমাত্র নাতি সুধাংশু আসে লেকে বেড়াতে—একা। লেকের যে দিকটা নির্জন সেইদিকে নিজের টু-সীটারখানা নিয়ে বার-কতক পাক দিয়ে বাড়ী ফিরে যায়। এ সব খোঁজ-খবর অজয় আগেই নিয়ে রেখেছিল।

তারপর দৈবাৎ একটা বাঁকের মুখে অজয়ের গাড়ীর সঙ্গে সুধাংশুর গাড়ীর ধাক্কা লাগতে কতক্ষণ?

সুধাংশু তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে বললে, "সরি, মাপ করবেন।"

অজয় গাড়ী থেকে নেমে পড়ে অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, "দোষ আমারই—মাপ চাওয়া আমারই উচিত। আমিই রং সা-ইডে আসতে চেষ্টা করেছিলুম।"

"না না—আমারই একটু দেখা উচিত ছিল বৈকি!"

এইভাবে খানিকটা বিনয়ের দ্বন্দ-যুদ্ধ চলার পর সুধাংশু বললে, "তারপর ওটার অবস্থা কি?"

হাসি হাসি মুখে মাথা নেড়ে অজয় বললে, "না. ও আর চলবে না। দেখি আমি বাসে ফিরে যাচ্ছি—পথে একটা ফোন ক'রে দিই এ-এ-বি কে। আর উপায় কি।"

"আপনি থাকেন কোথায়!" সুধাংশু জিজ্ঞাসা করে।

"এই আলিপুরের দিকে।"

"আরে, আমরাও যে ঐ দিকে থাকি। চলুন, পৌঁছে দিই।"

"না—না। থাকগে—বাসেই যাচ্ছি—" ইত্যাদি যথারীতি শিষ্টাচারের পর অজয় ওর গাড়ীতে উঠে বসল।

সুধাংশুদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে সুধাংশু বলে, "চলুন একটু চা খেয়ে যাবেন।"

অজয় বিনয় করে বলে, "আর কত অপরাধ বাড়াব।"

"ছি ছি—কিযে বলেন।"

চা খেতে খেতে সুধাংশু ওর দু চারটে খবর জিজ্ঞাসা করে, বাড়ীর ঠিকানা নেয়। বলা বাহুল্য বেপরোয়া মিছে কথা ব'লে যায় অজয়। একথা সেকথার পর সুধাংশু বলে, "দাদুর সঙ্গে আলাপ করবেন নাকি?"

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না অজয়। সে কি ঠিক শুনছে? এ যে মেঘ না চাইতেই জল!

মুখে বলে, "সে সৌভাগ্য কি হবে আমার।"

প্রকাণ্ড বড়লোক আর প্রকাণ্ড শিল্পপতি হ'লেও স্যার বীরেনের কথাবার্তা ভালই। অজয়কে বললেন, "সুধা বুঝি তোমার গাড়ীটা ভেঙ্গে দিয়েছে বাবা।"

"না না—সে দোষ আমারই।"

দু-চারটে খুচ্‌রো আলাপের পর স্যার বীরেন প্রশ্ন করেন, "বাবা কি করো।"

"আজ্ঞে কিছুই করি না। তবে করবার জন্যই চেষ্টা করছি।"

"কী চাও, চাকরী বাকরী?"

"আজ্ঞে না। সে ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। আমি

চাই ব্যবসা করতে। তার জন্যে যদি কোথাও শিক্ষানবিশী করতে হয় ত তাও রাজী।”

“মুলধন আছে ?”

“আজ্ঞে না। তবে খাটতে পারব।”

“হুঁ। আচ্ছা বাবা কাল আমার অফিসে একবার যেও—ঠিক সাড়ে দশটায়।”

লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে আর নাচতে নাচতে অজয় ফিরল। জগদীশও সব শুনে আনন্দ প্রকাশ করল খুব। অজয় বললে, “দেখলি অজয় চাটুয্যের বুদ্ধি আছে কিনা!……বাবা এক চালে বাজি মাৎ।”

পরের দিন বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ারও কোন অসুবিধা হ'ল না। দেখা গেল তিনি ব'লেই রেখেছিলেন বেয়ারাকে। অজয় যেতে স্যার বীরেন ওর হাতে একটা খাম দিয়ে বললেন, “আমাদের দিল্লী ব্রাঞ্চের ম্যানেজার শ্যামবাবুর নামে এই চিঠি দিলুম। তিনিই হয়ত তোমাকে কোন ওপ্‌নিং-এর সন্ধান দিতে পারবেন। কালই চলে যেও। আচ্ছা—”

তিনি আবার তাঁর ফাইলে মনঃসংযোগ করলেন। অজয় ত প্রস্তুতই। সে সেই দিনই দিল্লী মেলে রওনা হ'য়ে গেল।

গাড়ীতে প্রচণ্ড ভীড় কিন্তু অজয় নিজের বুদ্ধি-কৌশলে বেশ জায়গা করে নিলে। দিল্লী পৌঁছল বিকালের দিকে। জগদীশ ও-কে একটা সস্তার হোটেলের সন্ধান দিয়েছিল, সেইখানে গিয়েই উঠল। স্নান ক'রে একটু চাঁদনী চক অঞ্চলে ঘুরে টুরে বেড়াল। কিন্তু রাত্রে ভাল করে ঘুম হ'ল না—আশা ও আশঙ্কায়!

পরের দিন অফিসে গিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক করিডোরে বসে থাকবার পর ডাক পড়ল অজয়ের।

"কী ব্যাপার বলুন ত। আপনি নাকি বড় সাহেবের কাছ থেকে চিঠি এনেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সগর্বে বলে অজয়।

"কিসের চিঠি?"

"এই যে। খুলে দেখুন না।"

খাম খুলতে দেখা গেল তার মধ্যে দুখানা চিঠি—দুখানাই খামে মোড়া। একখানাতে শ্যামবাবুর নাম লেখা, আর একখানাতে অজয়ের।

অজয়কে আবার চিঠি কেন? কেমন যেন খট্‌কা লাগে অজয়ের। সে কম্পিত-হাতে চিঠিখানা খুলে ফেলে...

লিখেছে সুধাংশু:—"এইবার নিয়ে বহুবার হল কিনা! এ আমরা জানি। আমাকে উপলক্ষ ক'রে দাদুর সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা আপনি নিয়ে ছাব্বিশ জন করেছে। আপনি যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সে ঠিকানায় ও নামে কেউ থাকে না। মোটর গাড়ীখানাও আপনার নয় তা খবর নিয়েছি—প্রায় সব খবরই সংগ্রহ করছি। এসব ব্যাপারে আমাদের যে কতকটা সুবিধা আছে তা ভুলে যাচ্ছেন কেন? অন্য লোক হ'লে গ্রাহ্যই করতুম না কিন্তু আপনার অভিনয়টা ভাল লাগল ব'লেই ডেকে এনেছিলুম বাড়ীতে। আমারই একান্ত অনুরোধে দাদু আপনার সঙ্গে এ অভিনয়টুকু করতে রাজী হয়েছিলেন। আশা করি এই ব্যাপারে আপনার এ শিক্ষাটুকু হ'ল যে বড় লোকদের আর অতটা বোকা ভাববেন না।"

অজয়ের মনে হ'তে লাগল পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

শ্যামবাবু মুখ তুলে বললেন, "আচ্ছা, কী ব্যাপার বলুন ত, আমার চিঠিতে শুধু লেখা আছে যে পত্রবাহককে কলকাতা পর্যন্ত ফিরে আসার গাড়ী-ভাড়াটা দিয়ে দেবেন।"

মুহূর্তের মধ্যে অজয় সামলে নিলে নিজেকে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এ একটা খুব confidential কাজ। এর সব বিবরণ আপনাকে দিতে পারব না।"

শ্যামবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। শুষ্কস্বরে বললেন, "তা কত দিতে হবে আপনাকে?"

"তাইত। আমার উপর যা ইনস্‌ট্রাকশ্যান—এখান থেকে যেতে হবে অমৃতসর, সেখানে থেকে বিকানীর, ভবনগর, আমেদাবাদ বোম্বাই হয়ে ব্যাঙ্গালোর, সেখান থেকে ত্রিচি হয়ে মাদ্রাজ —তারপর কলকাতা। একটু হিসেব ক'রে দেখতে হবে। ব্র্যাডশ আছে!"

"আপনি আমাদের ট্রান্সপোর্ট ক্লার্কের কাছে যান সেখান থেকে ব্র্যাডশ দেখে যত টাকা হয় হিসেব মত ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে নিয়ে নেবেন। আমি ব'লে দিচ্ছি—"

ভারত পরিক্রমার ফার্স্ট ক্লাস গাড়ী ভাড়া হিসেব করে প্রায় সাড়ে সাত শ টাকা নিয়ে অজয় বাড়ী ফিরে এল।

দিন-তিনেক পরে সুধাংশু ফোন করলে, "না, আপনারই জিত। দাদু আপনার বুদ্ধির খুব তারিফ করেছেন। বলেছেন যে আমাদের বাড়ী আপনার অবাধ নিমন্ত্রণ রইল। আর যদি

সত্যিই ব্যবসা শিখতে চান, আমাদের অফিসে এসে বসে থাকতে পারেন চোখ এবং কান খুলে—পারেন কিছু শিখবেন। তবে এ ত বড় বড় ব্যাপার, ক্যাপিটাল চাই। চাকরী চান ত তাও পেতে পারেন।"

দুই বন্ধুতে মিলে আবারও পরামর্শ সভা বসল। জগদীশ বললে, "মামাকে বল—স্যার বীরেনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তিনি তোকে অফিসে যেতে বলেছেন। শুনলে মামা খুশীই হবেন। চাইকি এরপর ক্যাপিটালেরও অভাব হবে না।"

অজয় বললে, "না ছাখ। মামার সাহায্য না নিয়েও যে কিছু করতে পারি, সেইটে প্রমাণ করব। আমি চাকরীই করব। ওরা যদি চাকরী দেয় ত খুব একটা সামান্য চাকরী হবে না নিশ্চয়ই—"

অজয় চাকরীই নিলে। এধারে সুধাংশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পেকে উঠল। বাড়ীতে যাতায়াত। কিন্তু একদিন দেখা গেল সুধাংশুর একটি বোন আছে—এবং সেই আদুরী মেয়েটি অজয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়তে চায়। অগত্যা একদিন অজয়কে ডুব মারতে হল। কারণ অজয়ও ইতিমধ্যে প্রেমে পড়েছিল—এক টেলিফোন গার্লের। দিল্লী থেকে আসতে আসতে পথে আলাপ হয়েছিল। সে মেয়েটি বৈদ্যের, তাকে বিবাহ করায় মামা মত দেবেন না নিশ্চয়। অথচ এধারে তিন মাস মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। মামা সত্যিই এককথার মানুষ!

অজয় জগদীশের শরণাপন্ন হল—"কী করা যায় বল্!"

জগদীশ অনেক ভেবে বললে, "ঐ মেয়েটাকে—মানে তোর

প্রিয়া বকুলমালাকে মামার নজরে ফেলাতে হবে।"

"তার মানে?"

"কোন মতে ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে যদি ওঁর নজরে পড়তে পারে তাহলে আর ভাবনা নেই। তখন সহজেই রাজী হবেন। এখন এমন বিয়ে ত কতই হচ্ছে।"

"কিন্তু সেটা কি ক'রে হবে?"

"সে হবে। তোমার মামার সেই বইটা বেরিয়েছে না?"

"হ্যাঁ।"

"তবে ঠিক আছে। আমি একটা চিঠির মুশাবিদা ক'রে দিই—সেই চিঠিটা তুই বকুলকে দিয়ে কপি করিয়ে পাঠিয়ে দে দিকি।"

জগদীশ অজয় তথা বকুলকে যে চিঠি দিল তার অস্যার্থ হচ্ছে এই যে হরিহর বাবুর বই পড়ে বকুল মুগ্ধ। সে একবার ওকে দর্শন করতে পেলে ধন্য হয়ে যায়। বই থেকে দুচারটে লাইনও সে চিঠিতে তুলে দেওয়া হ'ল অর্থাৎ কত ভাল ক'রে পড়েছে তারই নমুনা-স্বরূপ।

পরের দিনই চিঠির জবাব এল। হরিহরের চাকর নিজে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে দিয়ে গেল। যে কোন সময় বকুলমালা যেতে পারেন—তাহ'লে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন রায় সাহেব হরিহর মুখুজ্জে।

জগদীশ বললে, "হুর্‌রা।"

অজয় বললে, "তোর কি বুদ্ধি মাইরি?" সে আবেগে জড়িয়েই ধরলে বন্ধুকে।

"কী খাওয়াচ্ছিস বল!"

"শুভ কায মিটে যাক। তোকে গ্রেট ইষ্টার্ণে এক দিন ভাল ক'রে ডিনার দেব।"

দিন সাতেক পরে একদিন হঠাৎ অজয় একটা সুটকেস হাতে ক'রে এসে উঠল জগদীশের বাড়ী। মুখ অন্ধকার।

"কী রে, ব্যাপার কি ?"

"চলে এলাম—for good !"

"তার মানে ?"

অনেকক্ষণ কোন কথা কইলে না অজয়, গুম্ খেয়ে বসে রইল। তারপর আরও খানিকটা সাধাসাধির পর বললে, "স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস করবে না, সর্বদা তার কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকবে—এই শিক্ষা আজ হোল, আর কি !"

"কেন ?" বকুলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি।"

আনন্দলেশহীন একরকমের শুক্নো হাসি হেসে বললে, 'ঝগড়া ?' আমার মত সামান্য লোকের সঙ্গে ঝগড়া করার আর তার প্রয়োজন নেই। তিনি এখন আমার গুরুজন !'

"তার মানে ?" জগদীশ উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ায়।

'মামার সঙ্গে আজ তার বিয়ে।"

"মামা ! বুড়ো রায়সাহেব ?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ। রায়সাহেব হরিহর মুখুজ্জে।"

"তার মানে ?"

"তার মানে রায়সাহেবের পয়সা আছে। তাঁকে বিয়ে করা মানে এখনই সে সবের মালিক হওয়া। আর আমি ভ্যাগাবণ্ড্। মামা মলে তাঁর বিষয় পাবো—ইতিমধ্যে আর কিছু হ'লে তা

থেকে বঞ্চিতও হ'তে পারি।”

“তা তুই কি করলি?”

“স্যুটকেস্ হাতে ক'রে বেরিয়ে এসেছি। আর কি করব।”

“বিনা প্রতিবাদে?”

“একবার তার বাড়ী গিয়েছিলাম, দেখা করেনি। বলে পাঠালে সময় নেই।”

“এখন কি করবি?”

“মুটেগিরি, ভিক্ষে—মামার বাড়ী চাকরী করা ছাড়া সব কিছু ···আর এমনিও, মামা না হয় মামী তাড়াত।”···

বিকেলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অজয় গড়ের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে দেখলে কম্যুনিস্ট পার্টির কী একটা মিটিং হচ্ছে এক জায়গায়। সে হঠাৎ তারই ফাঁকে উঠে এক প্রচণ্ড বক্তৃতা করলে। প্রসঙ্গটা ছিল কোন্ কারখানার শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা কমাবার বিষয় —সেখান থেকে অজয় অনায়াসে বড়লোকদের বিশেষত অলস ধনী লোকদের প্রসঙ্গে চলে গেল এবং মনের ঝাল মিটিয়ে মামাকে গালাগালি দিলে।

যে নেতা সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি খুব খুশী হয়ে ওকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। সভার শেষে যে কলেক্‌শ্যন হ'ল, তাতে অজয়ই টাকা তুলল সব চেয়ে বেশী। বাড়ী ফিরে দেখলে সেই টাকা থেকেই নেতা তাঁর বাজার খরচ এবং গয়লার টাকা দিলেন। আগে যে গয়লা দুধ দিত, সে সাত মাসের টাকা পায়নি—সে আসাতে নেতা তাকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। ক্যাপিটালিস্ট, বুর্জোয়া ইত্যাদি গালাগাল শুনে সে বেচারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। নেতার স্ত্রীও কোথা থেকে বক্তৃতা

সেরে এলেন। কিন্তু বাইরের শ্রমিকদের ছুটি নিয়ে যতই আন্দোলন করুন, বাড়ীর চাকর একদিন ছুটি চাওয়ায় অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠলেন। অজয় তাকে আড়ালে ডেকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতে গিয়ে শুনলে, আট মাসের মাইনে এদের হাতে—পালাবে কি নিয়ে?

গৃহিণী প্রথমে অতিথি জুটিয়ে আনায় স্বামীর উপর খুব বিরক্ত হয়েছিলেন কিন্তু অজয় তোষামোদে তাঁকে খুব খুশী ক'রে তুললে, তার ওপর স্বামী যখন গোপনে শুনিয়ে দিলেন যে আজকের টাকার অধিকাংশই অজয়ের রোজগার—তখন বেশী ক'রে যত্ন করতে লাগলেন।

কথায় কথায় অজয় আবিষ্কার করলে যে এদের সঙ্গে পার্টির কোন সম্পর্ক নেই—সবটাই ছদ্মবেশ।

পরের দিন মিটিংএ টাকা কলেকশ্যন্ করার পর প্রায় শ' দেড়েক টাকা নিয়ে অজয় সরে পড়ল।...

পচুর বাড়ীতেই থাকে বটে কিন্তু অজয় বুঝতে পারে যে ওর অসুবিধা হচ্চে। পচু পরামর্শ দেয় যে সরকারী কনট্র্যাক্ট দু'একটা জোগাড় কর। কে এক মিসেস্ চাউড্রি আছেন, তাঁর সরকারী মহলে অগাধ প্রতিপত্তি—তাঁকে কিছু টাকা দিলে সুবিধে হতে পারে।

মিসেস্ চাউড্রিকে খুঁজে বার করে অজয়। তিনি বলেন, "কোন্ মিনিষ্ট্রী? ইরিগেশ্যন্, হ্যাঁ—হবে। হাজার টাকা লাগবে। ক্যাশ প্লিজ.। টাকা দিয়ে যাবেন, তিন দিন পরে খবর।"

অজয়ের হাতে যা ছিল আর জগদীশ যা পারল জোগাড় ক'রে দিলে। হাজার টাকা গুণে দিয়ে এল। মিসেস্ চৌধুরী কোমল-কণ্ঠে বললেন, "চীফ.ও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। বলেন ত ওখানেও কিছু করতে পারি—তিন হাজার লাগবে!"

তিন দিন পর গিয়ে শুনলেন, মিসেস্ চৌধুরী ইউনেস্কোর কি একটা প্রতিনিধি হয়ে বিলেত গেছেন। ওর জন্যে একটা খাম আছে। খামখানা খুলে দেখলে এক সওদাগরী অফিসে পঞ্চান্ন টাকা মাইনের একটা টেম্পোরারী চাকরীর নিয়োগ-পত্র—ওর নামে।

অজয় আর পচার বাড়ী ফিরল না। অবশিষ্ট যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে রুদ্রাক্ষ মালা একছড়া এবং গেরীমাটি সংগ্রহ ক'রে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসল। সন্ন্যাসী বা জ্যোতিষী,—এখন এই একটি মাত্র পথই খোলা আছে। সংসার যখন তাকে এমন ক'রে ঠকালে, সে-ই বা ঠকাবেনা কেন? সন্ন্যাসী সেজে একদিন বকুলমালার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবে—আজ থেকে এই হবে ওর জীবনের ব্রত। *

* চিত্রনাট্যের উপযোগী করিয়া সংক্ষেপে রচিত। স্থানে স্থানে বিলাতী গল্পের প্রভাব আছে।

ছায়ার মায়া

কলকাতার জল কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না—স্থির করলুম কয়েকদিন কোথাও ঘুরে আসব। ভায়া পরামর্শ দিলেন, বিন্ধ্যাচল ত তোমাকে বেশ স্যুট্ করে, সেখানেই কেন যাও না।

কথাটা মন্দ লাগল না। কিন্তু বিন্ধ্যাচলে যে বাড়ীতে প্রত্যেকবার যাই, সেটাতে ইলেক্ট্রিসিটি নেই। এই পচা গরমে পাখা ছাড়া চলবে না। ভেবেচিন্তে পাণ্ডাকে চিঠি লিখলুম, বিজলী আছে এমন বাড়ী ঠিক করো। গিয়ে পাখা ভাড়া করা যাবে।

সাতদিন পরে পাণ্ডার কাছ থেকে উত্তর পেলুম। বাবুজী যেমনটি চাইছেন ঠিক তেমনটিই পাওয়া গেছে মির্জাপুর শহরে, গঙ্গার ওপর। বিজলী ত আছেই—আলো পাংখা সব লাগানোই আছে। সাহেবের বাড়ী—ফার্ণিচার ভি সব আছে। কোন তক্লিফ্ হবে না—বাবুজী এসে পৌঁছলেই হয়। কেরায়া ভি বহুত সস্তা—মোটে তিশ রূপেয়া।

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল।

দিলাম টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারে ত্রিশটি টাকা পাঠিয়ে, তারপর এক শুভদিন দেখে ট্রেনে চড়ে বসলাম। সঙ্গে রইল এক ঠাকুর, একটি চাকর এবং ভাগ্নীজামাই হরিদাস। হরিদাস অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে বসে ছিল—প্রস্তাবটা করতেই রাজী হয়ে গেল। একটি সঙ্গী পেয়ে আমিও বেঁচে গেলাম। হরিদাস সিগারেট খায় না—সুতবাং মামা শ্বশুরের সঙ্গে যেতে তার আপত্তি নেই।

পৌঁছে দেখলাম সে এক বিরাট কাণ্ড। কতকালের প্রকাণ্ড

বাড়ী। বিরাট পাঁচিল-ঘেরা বাগানের ভেতর দোতালা মস্ত বাড়ী। এক একটি তালা বোধহয় বিশফুট উঁচু, কিংবা আরও বেশি। বাড়িটার সবই বড় বড়। ঢালাই লোহার ফটক ছুটো যেন দৈত্য-পুরীর কপাট। বিপুল সিঁড়ি। দরজা জানালাগুলো দশ ফুট ক'রে উঁচু। এক একটা ঘর—কুড়ি ফুট লম্বা, ষোল ফুট চওড়া। নিচের তলায় খান-পাঁচেক ঘর—ওপর তলায় খান-তিনেক। এ ছাড়া নিচে ভেতর দিকে চাকর-বাকরদের জন্য আউট হাউস আছে—সেখানেও সার সার ঘর। খোলা হাঁ-হাঁ করছে। ভেতরে জমে-ওঠা জঙ্গলের গাদায় গাছ গজিয়ে গেছে সে সব ঘরে।

এত বড় বাড়ীটার মোটে ত্রিশ টাকা ভাড়া? পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞাসা করলুম।

তিনি একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই উত্তর দিলেন, 'এখানে কে এত টাকা দিয়ে ভাড়া নিচ্ছে বলুন। যে আসে তারই ছু-একটা ঘর দরকার হয়। কাজেই ভাড়া কমাতে হয়। ভাড়াটে আরও আসে, নিচের তলায় বসিয়ে দেব। আপনাদের জন্য ওপর তলা ধুইয়ে সাফ করে রেখেছি! নিচের তলাও ঝাড়ু দেওয়া আছে—কিন্তু আপনার ত দরকার হবে না।'

ওপর তলায় পৌঁছে বেশ আনন্দ হ'ল। বড় বড় ঘর। তাতে দামী মেহগ্নি খাট—গদীপাতা। পাখা আছে, আলো আছে। ওয়ার্ডরোব, দাঁড়া আয়না, টেবিল চেয়ার। বাথরুমে সাহেবী প্রথা। বাথটব অবধি আছে।

'কার বাড়ী এটা পাণ্ডাজী?' হরিদাস প্রশ্ন করলে।

'বাড়ী ত বাবুজী এক সাহেবের।' পাণ্ডাজী সবিস্তারে বলতে শুরু করলে, 'আগে এখানে নীলকুঠির এক সাহেব থাকত। তারপর

তার ছেলের কাছ থেকে কেনে আর এক সাহেব। ওর ছিল কার্পেট গালিচার কারবার, সে আবার নতুন ক'রে বাড়ীটাকে তৈরী করে। তারপর বিহার ভূ-কম্প হয়, মনে আছে আপনার?—সেই সময়ে সাহেবের বিবি ছেলেমেয়ে সব ছিল ওর শ্বশুর বাড়ী মজঃফরপুরে। এক মিনিটে সব খতম—সেই খবর পেয়ে সাহেব ছুট্‌ল সেখানে —আর ফিরল না। ওখান থেকে সোজা বিলেত চলে গেল। এই বাড়ীর জিম্মেদারী দিয়ে গেল ওর ভাতিজাকে। সে সাহেবের বড়া ভারী কারবার আছে ইলাহাবাদে, জৌনপুরে, চুনারে—সে এ বাড়ী নিয়ে কি করবে? এখানের চাবি দেওয়া আছে এক পুলিশের দারোগার কাছে। কেউ কিরায়ামে নেয় ত দেয়—নইলে পড়েই থাকে।'

মোটামুটি বাড়ীটা ভালই। চারিধারে বিস্তৃত বারান্দা। ইজি-চেয়ার আছে, বসে বসে গঙ্গা দেখার খুব সুবিধা। আমি ত তখনই বসে পড়লাম। হরিদাস আর পাণ্ডা মিলে বাজার হাট করলে—একটা স্থানীয় চাকরও ঠিক হ'ল—জল তোলার জন্যে। কলকাতার 'বাবু-চাকর' এই সিঁড়ি ভেঙ্গে জল তুলতে পারবে না।

এক কথায় গৃহস্থালী পেতে বসা গেল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শুয়েছি সকাল ক'রেই, কিন্তু ঘুম আসছে না। তার প্রধান কারণ—দুপুরে একটু দিবানিদ্রা হয়েছে, তার ওপর শুয়েছি রাত নটায়—কলকাতায় তখন সন্ধ্যা রাত। রাত বারোটার কম বাড়ীতে কোনদিনই শোওয়া হয় না। সুতরাং ঘুম আসাটাই বিচিত্র। তার ওপর অসহ্য গুমোট। পাখাগুলো বহুদিনের অব্যবহারে প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। তেল যে তাতে

কতকাল পড়েনি তার ঠিক নাই। কাজেই পাখা ঘুরছে মন্থরতম গতিতে, তাতে কিছু কঁ্যাচ, কঁ্যাচ, আওয়াজ হ'লেও হাওয়া হচ্ছে না কিছুমাত্র। ঘামে এখনই মাথার বালিশ ভিজে উঠেছে। শুধু এপাশ ওপাশ করছি।

সবচেয়ে বিপদ এই—হরিদাস দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। এইটে আরও অসহ্য। আপনার ঘুম হচ্ছে না—অথচ পাশেই একজনের নাকের ডাক নিয়মিত ছন্দে গর্জন ক'রে চলেছে—এ কতক্ষণ সহ্য করতে পারেন?

বিরক্ত হয়ে উঠে বসলাম।

বাইরে যাকে ব'লে নিঃসীম অন্ধকার। কালো মেঘের স্তূপ ঝুঁকে পড়েছে গঙ্গার ওপর। ফলে গঙ্গার জলও কালো হয়ে উঠেছে—সবটা জড়িয়ে একটা একাকার কালিমা। সামান্য হাওয়াও নেই কোথাও।

ওপরের তিনটা ঘরের একপ্রান্তের ঘরটা আমরা নিয়েছিলাম —আর এক প্রান্তের ঘরে ছিল ঠাকুর ও চাকর। মাঝের ঘরটা খালিই পড়েছিল। একেবারে খালি নয় ঠিক—বাক্স স্যুটকেস ইত্যাদি মালপত্রগুলো। কিন্তু এ ঘর থেকে ও ঘর অবধি মাঝের দরজাগুলো খোলাই ছিল। ফলে ও পাশের ঘর থেকে ঠাকুরদের নিয়মিত নিঃশ্বাস পড়ার শব্দও নিস্তব্ধ আবহাওয়া ভেদ করে এখানে এসে পৌঁচচ্ছিল।

এক কথায় সবাই ঘুমোচ্ছে, আমি ছাড়া।

বিরক্তিতে মন ভরে গেল। স্লিপিং ট্যাবলেট বা ঘুমের বড়ি সঙ্গেই ছিল—কলকাতাতে ত ওটি নিত্যসঙ্গী কিন্তু এখানে ওটা ব্যবহার করব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। সে প্রতিজ্ঞা আর রাখা

গেল না দেখছি। এমন ক'রে জেগে থাকার জন্য এখানে আসিনি—

বালিশের নিচে থেকে হাতড়ে ট্যাবলেটের শিশিটা বার করলুম। জল পাশেই আছে টুলের ওপর। কিন্তু বড়িটা বার ক'রে নিয়ে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াব এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। মাঝের দু'টো কম্যুনিকেটিং দোরই খোলা ছিল সম্পূর্ণ—হঠাৎ সেই চারখানা পাল্লা বিরাট শব্দে বন্ধ হয়ে গেল—এবং এক মুহূর্ত পরেই আবার নিঃশব্দে খুলে গেল।

কী রকম হ'ল? কোথাও এক বিন্দু বাতাস নেই। গঙ্গার বুকে জমাট মেঘ, গাছের পাতার ডগাটুকু পর্যন্ত কাঁপছে না। আমাদের ঘরের জানলার পাল্লাগুলো খোলাই রয়েছে—মাঝের ঘরটার বাইরের দিকের—অর্থাৎ দালান এবং বারান্দা দুদিকেরই—কপাট বন্ধ, হাওয়া তো কোথাও থেকে আসবার কথা নয়! হাওয়া নেইও—তবে এ বন্ধ হ'ল কোথা থেকে, বন্ধ করলে কে!

সে প্রচণ্ড আওয়াজে সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। হরিদাস ঘুমের ঘোরে চোর চোর বলে লাফিয়ে উঠেছে। ওধারে ঠাকুরের কণ্ঠে বহুদিন পরে মাতৃভাষা ধ্বনিত হয়েছে—'আউ! হেলা কঁড় ?'

আমি অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টর্চ জ্বেলে উঠে দাঁড়িয়েছি। ছুটে গিয়ে আলোটাও জ্বেলে দিলাম। পনেরো বাতির আলো মিট মিট করতে লাগল অত বড় ঘরটায়—কিন্তু তা হোক, সবই দেখা যাচ্ছে অন্তত।

এর পর আমরা চারটি প্রাণী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম সব। তিনটে ঘরের কাবোর্ড খুলে, ওয়ার্ডরোব খুলে, খাটের তলা, বাথরুম—সব। দালানের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরেব

বারান্দা বানরের ভয়ে মজবুত এক্স্প্যাণ্ডেড্ মেটালের জাল দিয়ে ঢাকা। কোথাও থেকে বাইরের কোন লোক আসবার সম্ভাবনা নেই। তবে এতবড় দরজার ভারি ভারি দু' ইঞ্চি পুরু কাঠের পাল্লা বন্ধ করলে কে—আবার তৎক্ষণাৎ খুললেই বা কে? খুব বেশী রকম ঝড় না উঠ্লে এমনটা হবার কথা নয়—অথচ বাতাস ত একেবারেই নেই। আর বাতাস এলে অন্য জানলাগুলোও ত বন্ধ হ'তে পারত!

কোন মীমাংসাই হ'ল না। অনেকক্ষণ ধ'রে গুল্তানি সার হ'ল শুধু। আমার তরুণ জামাতা বাবাজী হুকুম করলেন ঠাকুর চাকরকে, 'তোরা বরং এই ঘরে এসে শো।'

তারা ঠিক অবশ্য অতটা করলে না—আমাদের ঘরের সামনে বারান্দায় শু'ল।

কিন্তু পরের দিন ভোর বেলা উঠে আর সন্দেহ রইল না যে কোন লোকই এসেছিল আগের দিন রাত্রে। কারণ আমার বাথরুমের ঠিক মাঝখানে একরাশ ময়লা বা পুরীষ!

প্রথম ভেবেছিলাম আমার মূর্তিমানরাই কেউ ঘুমের ঘোরে উঠে এ কার্য করেছে কিন্তু তারা নানারকম কঠিন শপথ ক'রে অস্বীকার করলে। তা ছাড়া ওধারের ঘরের সঙ্গেও বাথরুম আছে। আমি বারবার সকলকে বলে দিয়েছি আমার বাথরুম যেন কেউ না ব্যবহার করে। তৎসত্ত্বেও এই কাণ্ড করবে, এমন সাহস কারও নেই। তাছাড়া আমার ত সমস্ত রাত ভাল ক'রে ঘুমই হয় নি—ওরা কেউ উঠলে আমি টের পেতুম।

মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। একেই ত এই প্রকাণ্ড

হানা বাড়ীটায় এসে পর্যন্ত মনটা কেমন ভারি ভারি লাগছে—সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন বুকচাপ, তার ওপর এসব কী কাণ্ড!

সেদিন রাত্রে বাথরুমে চাবি দিয়ে শুলাম। মাঝের ঘরের দরজার কপাটগুলো ছিট্‌কিনি দিয়ে আটকে দিলাম। সতর্কতার কোন ত্রুটি কোথাও রইল না। সেদিন ঘুমও এসে গেল সকাল সকাল—

অকস্মাৎ কিন্তু আবার সেই শব্দ!

দড়াম—দড়াম—

চম্‌কে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছিট্‌কিনি লাগিয়েছি আমি নিজের হাতে—মজবুত ছিট্‌কিনি, সে খুললে কে? আজও ত হাওয়া নেই। কাল পাখাটা সামান্য ঘুরছিল আজ সেটুকুও নেই। সন্ধ্যা থেকে অচল হয়ে রয়েছে!

তবে?

সকলেই উঠে পড়েছে ইতিমধ্যে। আজও তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল—কিন্তু সে কতকটা কলের মতই। কারণ সকলেই জানে যে বাইরের লোক কেউ নয়, বাইরের লোক আসবার কথা নয়—

মুখ শুকিয়ে উঠেছে আজ সকলেরই। হরিদাসের পা দুটো অল্প কাঁপছে তা আমি আগেই লক্ষ্য করেছি। ঠাকুরের চোখে মুখে ত স্পষ্টই বিদ্রোহের ভাব। আমি বেগতিক বুঝে আগেই বললাম, "মাঝের ঘরের এই দরজাগুলোও বন্ধ করে দাও, আর তোমরাও এই ঘরে এসে শোও।"

বাকী রাতটুকু ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না। ভোর বেলাই উঠে

পড়লাম, প্রাতঃকৃত্য সেরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবো বলে।

কিন্তু বাথরুমের চাবি খুলে ভিতরে গিয়ে দেখি—ঠিক আগের দিনের মত সেই একই জায়গায়—ময়লা! চাবিটা তখনও আমার হাতেই ধরা আছে। সারারাত বালিশের তলায় ছিল।

হরিদাস বললে, 'মামাবাবু চলুন, আজই একটা অন্য বাড়ী দেখে উঠে যাই।'

আমি বললুম, 'ত্মাখো তুমি আমি তুজনেই সায়েন্সের ছাত্র। আমরা যদি এইভাবে সামান্য কারণে পালাই ত লোকে বলবে কি? বিজ্ঞানপাঠকে ধিক্কার দেবে যে! আমাদের এত দিনের শিক্ষা সংস্কৃতি তবে কী কাজে লাগবে?'

অগত্য হরিদাস চুপ ক'রে রইল বটে কিন্তু মনে মনে যে খুব জোর পেলেনা—তা তার মুখ দেখেই বুঝলুম।

সন্ধ্যের সময় পাণ্ডাজী এলেন।

'বাবুজী, কোই তক্‌লীফ্ ত নেহি হোতা হ্যায়?'

একটু চটেই ছিলুম। বললুম, 'ঠাকুর খুব বাড়ী দিয়েছ। তোমার খুব দয়া। এখন এখান থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি।'

পাণ্ডাজী একটু যেন কেমন ভাবেই প্রথম প্রশ্নটা করেছিলেন। এখন আমার কথা শুনে তাঁর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল, 'কেঁও বাবুজী, কেয়া বাত হ্যায়? এয়সা কোই ডর-উর ত নেই লাগতা?'

তৎক্ষণাৎ চেপে ধরলে হরিদাস, 'কেন, তুমি ভয়ের কথা জিজ্ঞেস করছ? কী ব্যাপার বলো ত?'

'নেহি নেহি বাবুজী—এয়সা কোই খাশ বাত নেহি হ্যায়! অমি ভাবল কি এত্তা বড় বাড়ী আছে, আর বাবুদের ভি আদমী

কম—ডর ত লাগতেই পারে !”

প্রশ্ন করলুম, ‘ঠিক ক’রে বল দেখি ঠাকুর—কোন ভয়ডর সত্যিই আছে কি না !’

‘না, না কুছ্ না, কুছ্ না, এমন বাড়ী আপনাকে হামি দেব ? বিন্ধ্যবাসিনী জানেন, আমি আপনাদের জন্য কেতো ভাবনা রাখি।’

‘তাহ’লে ঠাকুর এসব ব্যাপার কি বলো ত !’

খুলে বললাম ঘটনাটা।

শুন্‌তে শুনতে পাণ্ডা ঠাকুর একটু সরে বসলেন কাছাকাছি—সেটাও লক্ষ্য করলুম। তারপর উত্তর করলেন, ‘নেহি নেহি বাবুজী, ইসব ভ্রান্তি হ্যায়। এ রোকম কভি কভি হোতা হ্যায় বাবুসাহেব। লেকিন কুছ ডর নেহি—গঙ্গামায়ীকা ইলাকা হ্যায়, বিন্ধ্যবাসিনী মাতাকী আস্থান—হিঁয়া কুছ ডর নেহি। জয় রামজীকি।’

বলে তিনি উঠে পড়লেন। হরিদাস বসতে বললেও তিনি বসলেন না—বললেন, জরুরী কাজ মনে পড়ে গেছে, বসবার উপায় নেই। তারপর আমাদের সমবেত নমস্কারান্তে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে হাতটা তুলে “জয় সীতারাম, জয় সীতারাম” বলতে বলতে নেমে গেলন।

তখন বারান্দায় বসে ছিলাম। সেদিন সন্ধ্যাবেলাই বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। পরিস্কার আলোয় দেখলাম পাণ্ডাজীর পিছু পিছু কথা কইতে কইতে যাচ্ছে আমাদের চাকর হারু।

ফিরে এলে এম্‌নি অলস কৌতূহলেই প্রশ্ন করলুম, ‘তোর আবার পাণ্ডাজীকে কি দরকার হ’ল রে ?’

সে হেসে বললে, ‘আমার কেন দরকার হবে বাবু। দরকার ঠাকুর মশাইয়েরই। সিঁড়ির মুখে আমাকে পাক্‌ড়াও

করলেন। বললেন, জিরাসা ফটক তক্ পঁওছায় দেও, বহুত ডর লাগতা।'

হরিদাস ত চটে আগুন, বলে—'কাল এলে ওর টিকি কেটে ছেড়ে দেব। ভণ্ড জোচ্চোর কোথাকার। জেনে শুনে একটা ভুতুড়ে বাড়ীতে তুলে দিয়েছে—আবার মুখের সামনে সাওখুড়ি ছাখোনা।'

অতি কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করি।

সেদিন রাত্রে আর দরজার আওয়াজ হ'ল না। কারণ মধ্যের ঘর একেবারে বন্ধ ক'রে শুয়েছি। কিন্তু তবু মাঝ রাতে কেন জানি না—ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে প্রাকৃতিক কার্য সেরে এসে শুলাম—কিন্তু আর কিছুতেই ঘুম এলো না। ঘড়িতে দেখি রাত দুটো, এখন আর ঘুমের ওষুধ খাবার মানে হয় না! জেগেই রইলাম।

একটু পরে মনে হ'ল দূর থেকে কী এক ধরণের সঙ্গীতের শব্দ ভেসে আসছে। খুব মৃদু—কিন্তু অস্পষ্ট নয়। ক্রমে আর একটু জোর হ'ল। কে যেন নাচ্‌ছে কোথায়, নূপুর পায়ে—তার সঙ্গে সারেঙ্গী তবলার সঙ্গত চলছে—ভাল লাগল খুব। কান পেতে শুনতে লাগলুম।

বেশ নাচছে তালে তালে। অতি মধুর লাগল আওয়াজটা।

এত রাতে নাচগান হচ্ছে কোথায়?

বেরিয়ে বারান্দায় এলাম—শব্দটা আরও মৃদু হয়ে গেল। না, পাড়ায় কোথাও নয়।

ভেতরের দালানে এসে দাঁড়াতে কিছুটা জোর হ'ল বরং।

আরে—এ যেন মনে হচ্ছে আমাদের ভেতরের বাগানেই নাচ

গান হচ্ছে—

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম কেউ কোথাও নেই ত। কুয়াতলা, নিচের খোলা বাথরুম, বাঁধানো চাতাল সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নাচ গান ত দূরের কথা—মানুষেরই চিহ্ন নেই কোথাও। ওপাশের আউট-হাউসগুলো তেমনি ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে হা-হা করছে, সেখানেও জনমানবের অস্তিত্ব নেই, থাকা সম্ভবও নয়।

অথচ বেশ মনে হচ্ছে ঐ নিচে থেকেই—

আস্তে আস্তে দালানের খিল খুলে সিঁড়িতে বেরিয়ে এলুম। বাইরের দিকে। খোলা সিঁড়ি চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। একটুও ভয় হ'ল না তখন। শুধু কৌতূহল আর ঐ মধুর শব্দের দিকে একটা অদম্য আকর্ষণ।

নেমে এসে বাগানে পড়লাম।

ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে শব্দটা। যেন মনে হচ্ছে ঐ নিমগাছের পাশের বাঁধানো চবুতারাটা থেকেই শব্দটা আসছে। যেন ঐখানে নাচছে কেউ—

আরও কাছে এলাম

সঙ্গীতে ডুবে যাচ্ছি। মধুর সঙ্গীত আর লঘুপায়ের নাচ। অশ্রান্ত, অক্লান্ত সে নাচ। কখনও দ্রুত কখনও বিলম্বিত তার লয়—কিন্তু থামছে না কখনই। সারেঙ্গতব্‌লারও যেমন বিশ্রাম নেই, তেম্‌নি ঘুঙুরেরও না।

অভিভূতের মত এগিয়ে গেলাম বাঁধানো চাতালটার কাছে।

হ্যাঁ, এইখানেই ত। এইখানে ত নাচ হচ্ছে। মনে হ'ল আমার সামনেই নাচছে কে। তাকে ছুঁতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছিনা,

একথাও ক্রমশ যেন ভুলে গেলাম। মনে হ'ল ঐ ত ওর পেশোয়াজের প্রান্ত উড়ছে আমার চোখের সামনে, ঐ ত শুনতে পাচ্ছি তার দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ। এমনকি আমারই আশে পাশে বসে যারা তব্‌লা ঠুকছে বা সারেঙ্গে ছড়ি টান্‌ছে তাদের ক্লান্ত দ্রুত নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। যেন তার উষ্ণতাও অনুভব করছি,—

কতক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম জানি না—হঠাৎ একটা কুকুর ডেকে উঠতে যেন তন্দ্রা ভঙ্গ হ'ল।

এ কি, কত রাত হ'ল?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত চারটে বাজে। উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি। এখন যেন কেমন গা-টা ছম্‌ ছম্‌ করছে। খোলা আউট-হাউসগুলোর দিকে চেয়ে মনে হ'ল কারা যেন ওখান থেকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে নিঃশব্দে—কিন্তু হিংস্র দৃষ্টি মেলে—

এক রকম ছুটেই ওপরে চলে এসে দালানের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলাম।

চম্‌কে উঠে হরিদাস তন্দ্রা-জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "কে?"

উত্তর দিলাম, "কেউ না, আমি!"

পরের দিন সকালেও কথাটা কাউকে বললাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, সে রাত্রেও যদি ঐ রকম শুনি ত এদের ডেকে শোনাব।

কিন্তু তার আগেই সন্ধ্যারাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না, হারুকে সঙ্গে নিয়ে হরিদাস গিয়েছিল বাজারে—ঠাকুর রান্না করছে, আমি আস্তে আস্তে নেমে

এসে সেই বাঁধানো চাতালের কাছে দাঁড়ালুম। সে সময়ই কিছু শুনতে পাওয়া যায় কিনা—এইটে পরীক্ষা ক'রে দেখাই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না—বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সত্বেও না।

শোনা কিছু গেল না বটে কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। আকাশ নির্মেঘ, শুক্লাচতুর্দ্দশীর চাঁদ বেশ খানিকটা উঠে পড়েছে ইতিমধ্যেই। পরিষ্কার ফুটফুটে জ্যোৎস্না! কোথাও মেঘের কোন চিহ্নও নেই। তবু মনে হ'ল যে আমার মাথায় এবং চারপাশে কিসের একটা ছায়া। যেন এক টুকরো মেঘ ঠিক আমার মাথা আর চাঁদের মাঝে আড়াল রচনা করে রেখেছে। অথবা একটা চাঁদোয়া কি তেরপল খাটানো হয়েছে আমার মাথার ঠিক ওপরে।

অকস্মাৎ একটা দারুণ আতঙ্ক অনুভব করলুম, যা এ ক'দিন একদম করিনি। এমন ভয় পেয়ে গেলুম যে ভরসা করে ওপ-রের দিকে তাকিয়ে দেখতেও পারলুম না। অবশ্য দেখার দরকারও ছিল না—কারণ সামনে পিছনে যেদিকে তাকাচ্ছি চক্‌চকে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না—কোথাও মেঘ নেই। খামোকা আমারই মাথার ওপর ঐ মেঘটি এসে স্থির হয়ে থাকবে—এ কখনও সম্ভব নয়।

ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। পা দুটোও যেন এবার ভেঙ্গে পড়তে চাইছে, আর এতটুকু জোর নেই।

স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম ইষ্টমন্ত্র—সব যেন গুলিয়ে গেল। কোন মতে সীতারাম নাম মনে এল। অস্ফুট কণ্ঠে একবার উচ্চারণ ক'রে—দু এক পা পিছিয়ে এলাম। ছায়াটাও সঙ্গে সঙ্গে সরে এল। আমি আর আমার চার পাশে তিন হাত করে মাত্র

স্থানে সেই ছায়া।

এবার একটু দ্রুতই পিছিয়ে গেলাম।

ছায়াও ঠিক সেই গতিতে সরছে।

মনে হ'ল মাথা থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে কে বরফ জল ঢেলে দিচ্ছে। পায়ে আর একটুও বল নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—

কিন্তু যেতেই হবে এখান থেকে। কে জানে হয়ত এখনই ঐ পদার্থটা আমার ওপর পড়ে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেবে। চিরকালের মতই নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যাবে—

মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—।

ইষ্টমন্ত্রটা মনে পড়ে গেছে। মা বাঁচাও, মা রক্ষা করো—

একটু যেন পায়ে জোর এল। কিন্তু পিছু হঠ্‌তে হঠ্‌তে এ কোথায় এসে পড়েছি? ওপরের সিঁড়ি ত ওদিকটায়—?

তখন আর ভাববার সময় নেই। টলতে টলতে হাতড়াতে হাতড়াতে দু'বছরের শিশুর মত দৌড়তে লাগলাম সোজা ফটকের দিকে।

কী সর্বনাশ! ছায়াটাও সঙ্গে সঙ্গে আসে যে।

আমিও যত জোরে দৌড়ই ওটাও তত জোরে চলে—সেই আমাকে ঘিরে আছে অশরীরী বা শরীরী কোন ছায়া।

অনেকদিন আগে এক মার্কিন ছায়াছবিতে প্রকাণ্ড ভ্যামপায়ার বা রক্ত চোষা বাদুড় দেখেছিলাম—তেম্‌নিই কোন ভ্যাম্‌পায়ার আমাকে তাগ্‌ করছে না ত?

অস্ফুট একটা আর্তনাদ ক'রে যেন ঠিক্‌রে ফটকের বাইরে রাস্তায় এসে পড়লাম।

আঃ! কী শান্তি!
ছায়াটা আর নেই।

আমাদের বাড়ীর ঠিক পাশেই এক মুসলমানের দোকান ছিল। তামাক, টিকিয়া, পাতা, কাঠ, কাঠ-কয়লা, কিছু মাটির বাসন এমনি রকমারী জিনিস বিক্রী করত! সন্ধ্যা বেলা খদ্দের বিশেষ থাকত না বলে দোকানের সামনে খাটিয়াটি পেতে বসে গুড়গুড়িতে তামাক টান্‌ত।

তখন আর আমার একমুহূর্তও দাঁড়াবার অবস্থা নেই। চলবার শক্তি ত নেই-ই। কোন মতে এসে ধপাস ক'রে বসে পড়লাম সেই বুড়োরই চারপাইয়ের একধারে।

বৃদ্ধ কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হ'ল না। বরং সস্নেহ সহানুভূতির সুরেই বললে, 'কেঁও বাবুজী, ডর লাগ গিয়া—কেয়া?'

'হাঁ, বড়ে মিয়া, বহুত।...জেরা, জেরা পানি পিলাইয়ে গা?'

'জী হাঁ, বহুত খুশি সে! লেকিন্ বাবুজী, ম্যয় মুসলমান্ হুঁ!'

'উস্‌মে কেয়া? পানিকা ভি ধরম হ্যায়?' কোনমতে বলি। গলা এমন শুকিয়ে গেছে যে—কথা কওয়াও যাচ্ছে না।

বদনা নয়—ঝক্‌ঝকে মাজা লোটাতেই জল এনে খাওয়ালে বড় মিঞা। তারপর পাশে বসে বললে, 'বাবুজী, আপ্‌কা বহুত তন্দুরস্তি হায়। আপকে পহ্‌লে আউর কোই এক রোজ ভি হুঁয়া ঠাহর্‌নে নেহি সকা।'

'লেকিন বাত কেয়া হায় বড়ে মিঞা—হুঁয়া কৈ দানো হায় কেয়া?'

'জরুর! ইয়ে বাত ত সবকোই জানতা হায়। কোই কোই

পরদেশী কভি লে লেতা, বেচারে। লেকিন হিঁয়া কো কই আদমি রাতমে উহ্ ফটককে অন্দর নেহি জায়গা। সচ্ বাবুজি!'

ততক্ষণে একটু সুস্থ হয়েছি। বড় মিঞাকেই চেপে ধরলাম। ব্যাপারটা কি জানা দরকার।

বড় মিঞা মুহূর্ত-কয়েক নিঃশব্দে গুড়গুড়িতে টান দেবার পর সেটা নামিয়ে রেখে যা বললেন, তার অস্মার্থ হচ্ছে এই :—

বহুদিন আগে যখন নীল কুঠির সাহেব এ বাড়ীতে থাকত—তখনকার ঘটনা। তখন এই আসগার মিঞা খুব শিশু—এখন ওঁর চার কুড়ি বয়স হয়েছে। ঘটনাটা সে শুনেছে তার বাপ-জানের কাছ থেকে।

সাহেব বড় মাতাল ছিল, আর দুর্দান্ত বদ্‌মেজাজী। ওর জরু বিরক্ত হয়ে একদিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বিলাইত চলে গিয়েছিল আর ফেরেনি। সাহেব একাই থাকত। মাঝে মাঝে নাচওয়ালী আনাত দু'একটা কিম্বা রেণ্ডি—সারারাত হল্লা করত।

একবার কার মুখে প্রশংসা শুনে লক্ষ্ণৌ থেকে আনালে জহুরা-বাইকে। জহুরাবাই অনেক সাধ্য-সাধনায় দৈনিক হাজার টাকার কড়ারে এল তিন দিনের জন্য।

প্রথম দিনটা গেল। দ্বিতীয় দিনে সাহেব ওর দিকে হাত বাড়াল। জহুরাবাই পিছিয়ে গিয়ে বললে, 'খবরদার সাহেব। আমি সে নাচওয়ালী নই। নাচ দেখাবারই কথা আমার সঙ্গে—অন্য কোন কথা নেই।'

সাহেব বললে, 'বেশ সে কথা এখন হোক। কত টাকা চাই?"

জহুরা বললে, 'দশ হাজার টাকা দিলেও না। তার জন্য অন্য মেয়েমানুষ আছে। তাদের আনিয়ে নাও।'

সাধ্য সাধনা। সাহেব চেক বই এনে বললে, 'বলো, কত টাকা দিতে হবে।'

জহুরাবাই অচল অটল। তার সঙ্গে যেটুকু কথা আছে তার বেশি সে পারবে না।

তৃতীয় দিনে সাহেব—ঐ যে বাঁধানো চত্বরটা—ঐখানে নাচের মজলিস বসালে। দর্শক একা সাহেব—ফটক সন্ধ্যা থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ আসতে পারবে না। বসে বসে নাচ দেখছে আর বোতলের পর বোতল মদ খাচ্ছে। শেষে রাত বারোটার সময় জহুরাবাই হাত জোড় ক'রে ছুটি চাইলো।

সাহেব অকস্মাৎ দু হাতে দুটো পিস্তল বার করলে। বললে, 'উঁহু, contract is contract—তিন রাত তোমার নাচবার কথা। কোন সময়ের হিসেব ত ছিল না। আজ সারারাত তোমাকে নাচতে হবে। কাক ডাকলে তবে ছুটি। থেমেছো কি গুলি করব।'

ওদের মুখ শুকিয়ে উঠল। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানে সাহেবের চোখ দুটো লাল, মুখখানা দানবের মত বীভৎস হয়ে উঠেছে। হাতে গুলি-ঠাসা পিস্তল—কারুরই থামতে সাহস হ'ল না। বাইজীও নেচে যায়, তবল্‌চি সারেঙ্গীও বাজিয়ে যায়। আর একাগ্র উগ্র দৃষ্টিতে স্থির হয়ে বসে সেই নাচ দেখে সাহেব, হাতে সেই উদ্যত পিস্তল।

একবার ক্লান্তিতে পা আপনিই থেমে গিয়েছিল, সাহেব সঙ্গে সঙ্গে এমন গুলি ছুঁড়লে, একটা বাইজীর কানের কেরাপাত নিয়ে চলে গেল—আর একটা গেল সারেঙ্গীর টুপী ফুটো ক'রে। হা-হা ক'রে হেসে উঠল সাহেব পিশাচের মত।

'চালাও চালাও, নইলে বুঝেছ ত আমার হাতের টিপ? গুলি

ঠাসা আছে পিস্তলে। মদ খেলে আমার হাতের টিপ খোলে ভাল।'

আবারও সেই হা-হা হাসি।

অগত্যা নাচতে হয়।

অবশেষে সত্যিই মাথার ওপর কাক ডেকে উঠতে সাহেব উঠে দাঁড়াল। বাইজীও থামল। কিন্তু এতক্ষণ যেন কিসের ঘোরে নাচছিল, থামার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল—একেবারে খতম! ঐ অবস্থা দেখেও কিন্তু সারেঙ্গী তবল্‌চীরা আর দাঁড়ায় নি। সোজা উঠে, পাঁচিল টপ্‌কে পথে নেমে দৌড়ে পালিয়েছিল, একদম ইষ্টিশন।

তখনও আলো ফোটবার একটু দেরি ছিল। সাহেবের হুকুমে সাহেবের মগ আরদালী ঐখানে মাটি দিয়ে দিলে মেয়েটাকে।...

এই পর্যন্ত বলে বড় মিঞা থামল।

আমি বললাম, 'তারপর ?'

তারপর আর কি! কথাটা কানা-ঘুষা হ'ল। পুলিশে খবর নিতে শুরু করলে। বেগতিক দেখে সাহেব একদিন গলায় ঐ পিস্তলটা লাগিয়েই আত্মহত্যা করলে।

তারপর অনেকদিন বাড়ী খালি পড়ে ছিল—পঞ্চাশ ষাট বছর। বাড়ী ঘর ভেঙ্গে পড়ে গেল। গাছপালা বনজঙ্গলে ঢেকে গেল সবটা। তারপর এল এই গালিচাওয়ালা ডানকান সাহেব। সে ওসব মানত না। জলের দামে জমিটা কিনে নতুন ক'রে সবটা তৈরী করালে, মনের মত ক'রে সাজিয়ে নিজে এসে উঠল। কিন্তু কিছু দিন পরেই মেমসাহেব আর টিকতে পারল না। নানা রকম উপদ্রব হ'তে লাগল। মেমসাহেব পাদরী আনালে, কত ভজন গান-টান হ'ল, কিন্তু কিছুতেই কিছু না। শেষে সাহেব মেমে

ভীষণ ঝগড়া। সাহেব বলে মানুষকে কখনও ভয় করলুম না, ভূতকে ভয় করব? নেভার! মেম বললে, তুমি থাকো তবে —আমি চললুম! মেমসাহেব চলে গেল বাপের বাড়ী মুজঃফরপুরে। ব্যস্—হ'ল ভূকম্প, সব শেষ হয়ে গেল। সাহেবও সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে গেল।

'সেই থেকে পড়েই আছে বাবুজী। কে বাস করবে এখানে? অজান্তে কেউ যদি ভাড়া নেয়—একরাত পরেই পালায়। এই যা আপনিই দেখলুম তিন চার দিন কাটালেন। কিন্তু আর থাকবেন না হুজুর, ভালয় ভালয় কালই চলে যান অন্য কোথাও। বাড়ীর অভাব কি!'

হরিদাস বাজার ক'রে ফিরেছে তখন—তাকেও ডেকে আসগার মিঞা সদুপদেশ দিয়ে দিলেন। হরিদাস আমার মুখে সব ঘটনা শুনে বললে, 'কোনমতে রাতটা এই পথে কাটাবো মামা—ও বাড়ী আর ঢুকচি নি। কাল সকালে অন্য বাড়ী দেখে মালপত্র নিয়ে চলে যাওয়া যাবে।'

অতি কষ্টে বুঝিয়ে তাদের নিয়ে বাড়ীতে ঢুকলাম। কিন্তু সেদিন সারারাত কারুরই ঘুম হ'ল না।

নলিনীর যখন বিয়ে হ'য়েছিল মায়া তখন খুবই ছোট, মোটে বছর দশেকের মেয়ে। তবু সে নাক-সিঁটকে বলেছিল, 'নলিনীদিটা যেন কী, আমি হ'লে বরং গলায় দড়ি দিতুম—তবু এমন বিয়ে করতুম না।'

তার কারণও ছিল।

মায়ার মা তরঙ্গিণীরও কতকটা এই ধরণের মনোভাব ছিল। তিনি কথায় কথায় বলতেন, 'যাই বলো বাপু, বিয়ে মানুষের একবারই হয়, ভাবসাব হ'ল একটু একটু ক'রে,—নতুন দুটো মানুষ একটু একটু ক'রে পুরোনো হ'ল দুজনার কাছেই, দুজনেই দুজনকে চিন্‌ল, তারপর ধীরে ধীরে এক হ'য়ে গেল—অন্ততঃ মনের দিক দিয়ে—এই হ'ল বিয়ে। এই যে সব দুবার তিনবার বিয়ে করে—এসব কি আর বিয়ে? রামোঃ?'

কেউ হয়ত বললে, 'না ন'দি, তুমি একেবারে জিনিসটা উড়িয়ে দিতে পারো না, ধরো একটা লোক ছাব্বিশ বছরে বিয়ে করলে—আটাশ বছরে তার বৌ মরে গেল। সে আর বিয়ে করবে না? সারা জীবনটা তার সাম্‌নে পড়ে রইল।'

তরঙ্গিনী জবাব দিতেন, 'হ্যাঁ, তার হয়ত বিয়ে করাটা দরকার কিন্তু মেয়েদের কথা ভাব দেকি! যত কম দিনই ঘর করুক—বর কেবলই মনে মনে মিলিয়ে দেখে সেই আগের বৌয়ের সঙ্গে—আর খুঁৎ খুঁৎ করে। সে বৌয়ের দোষগুলো তখন গুণ হয়ে ওঠে। মনে করে এ ঠিক তেমন হ'ল না। আর বৌটারও পোড়া কপাল, যত যত্ন-আত্তিই করুক না কেন বর—ভাববে

সেই সতীনকেই বেশী ভালবাসত, এখনও হয়ত মনে মনে তাকেই ভালবাসে। কিছুতেই মেয়েটা স্বস্তি পায় না। না ভাই, যত কম দিনের জন্যেই হোক্, আগে একটি বিয়ে করা থাকলে যেন মনের মধ্যে দেওয়াল পড়ে যায়।'

একটু থেমে হয়ত আবারও বলতেন, 'সোনার গয়নাই বলো আর রাজ-অট্টালিকাই বলো, বরই যদি নিজস্ব না হ'ল ত কী সুখ, আমার মনে হয় বড়লোকের ঘরে তেজবরে দোজবরে পড়ার চেয়ে গরীব চাষীর ঘরে পড়াও ঢের ভালো।'

এসব কথাই মায়া শুনেছে ছেলেবেলা থেকে, তাই নলিনীর বিয়েতে সে যে অমন মন্তব্যটা করবে এটাই স্বাভাবিক, ভাল ক'রে সাংসারিক জ্ঞান হবার আগেই বার বার শোনা-কথাগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে।

তা-ছাড়া নলিনীর বিয়েতে সকলেই—পাড়াসুদ্ধ ছি ছি করছিল। কাজেই ছোটমুখে বড় কথা হ'লেও খুব বেমানান শোনায়নি কথা-গুলো। পাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে নলিনী, ওর রূপে নাকি অন্ধকার ঘর আলো হয়ে উঠত। ছি ছি, ওর বাবা করলে কি, অমন মেয়েটাকে শেষ অবধি দিলে কিনা দোজবরের হাতে।

পাড়ার লোকের এই সম্মিলিত ধিক্কার নলিনীর বাবা সতীশ-বাবুর কানেও উঠেছিল বৈ কি! তিনি ব্যাকুলভাবে সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তাঁর যে অবস্থা তাতে হয়ত অমন সোনার প্রতিমা মেয়েকে কোন মাতাল লম্পটের হাতে দিতে হ'ত। হয়ত এমন ঘরে পড়ত যেখানে দু-বেলা দু-মুঠো পেট ভরে খেতেও পেত না। এখানে আর যাই হোক্, খাওয়া পরার কোন অভাব থাকবে না, দোজবরে বটে, একটা বড় দশ বছরের মেয়ে আছে—

এটাও ঠিক—কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সটা ঠিক বুড়োর বয়স নয়, তাছাড়া অত ঐশ্বর্য—নলিনী বলতে গেলে রাজার ঘরে পড়ল। আট বছরের উমা যে বুড়ো শিবের হাতে পড়েছিলেন, তাঁর ভাগ্য কি যে কোন হিন্দু মেয়ের কাম্য নয়!

কিন্তু এসব সত্ত্বেও পাড়ায় ঢিঢিক্কার বড় কম পড়ে যায় নি। পাড়ার ছোকরার দল—সত্য কথা বলতে কি—শেষ দু-তিন দিন ভাল ক'রে কেউ খায় নি, তখনকার দিন ব'লে বিয়েটা নির্বিঘ্নে হতে পেরেছিল, এখনকার দিন হ'লে জামাইকে শেষ পর্যন্ত মুখ চুন ক'রে ফিরে যেতে হ'ত।

তবে সে ধিক্কার এবং পরিতাপের কথাটা মায়ার যেমন মনে আছে তেমনি আর একটি কথাও কিন্তু সে ভোলেনি।

নলিনীর ধূলোপায়ে-দিন করতে আসবার স্মৃতিটা মনের মধ্যে আজও ওর উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। দিনের বেলা সে দেখেনি। সন্ধ্যেবেলা নলিনীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে তার মা এসেছিলেন ওদের বাড়ী। সতেরো বছর মাত্র বয়স কিন্তু এখনকার অধিকাংশ মেয়ের মত বান্‌খুরে ছিল না সে—বেশ বাড়নসা গড়নে রূপটা তার আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। আর সেইজন্যেই বোধ হয়—অলঙ্কার এবং সাড়ীর ঝলমলানিটাও অত বেশী ক'রে চোখে পড়েছিল। আজও সে ছবিটা মনে আছে মায়ার—। সেকেলে ডবল উইকের টেবিল ল্যাম্পের আলো, তবু তাতেই মাথার হীরের টায়রা এবং গলায় চুনি-পান্নার নেকলেস যেন জ্বলে উঠেছিল। শঙ্খ-কণ্ঠে মুক্তোর 'কলার'এ অমন আভা জীবনে কখনও দেখেনি সে।...তার সঙ্গে ছিল জড়োয়া ব্রেসলেট ও নতুন কাজ করা চওড়া সোনার চুড়ি। সেদিন নলিনীর দিকে চেয়ে চোখ ঝলসেই গিয়ে-

ছিল মায়ার। ঐ অল্প বয়সেই মনে হয়েছিল এই গহনা এবং এ বেনারসী শাড়ী ছাড়া এ দেহে মানাত না। আর শাড়ী গহনারও এর চেয়ে সদ্‌গতি আর কিছু হ'তে পারে না—এই দেহে উঠেই তারা সার্থক হয়েছে, তাদের যোগ্য মূল্য পেয়েছে তারা।

এমন কি তরঙ্গিণীও—ওরা প্রণাম ক'রে জল খেয়ে চলে যেতে —একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'নাঃ, ও বাড়ীর বটঠাকুরের দোজবরের হাতে মেয়ে দেওয়া সার্থক হয়েছে। নিতান্ত যদি দিতেই হয় ত এই রকম—'

কিন্তু সে দীর্ঘকালের কথা।

তারপর বহু বৎসর কেটে গিয়েছে, কবে কখন সকলের অগোচরে মায়ার দেহখানি পুষ্পিত হয়ে উঠেছে নবীন কৈশোরে, কখন তাতে আরও দুটি তিনটি বসন্ত প্রথম যৌবনের ঐশ্বর্যসম্ভার এনে যোগ করেছে,—আবার কেমন ক'রে একটির পর একটি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এনে দিয়েছে রুক্ষতা ও কাঠিন্য—দশ বছরের মেয়ে বাইশ বছরে এসে পড়েছে—তা বাঙ্গালীর একান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের দুঃখ-দারিদ্র্য বিব্রত ক'টি নরনারী লক্ষ্যও করে নি। এমন কি মায়া নিজেও না—

এর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে ঢের। মায়ার বাবা মারা গিয়েছেন। ওর দিদির বিয়েতে তিনি বিপুল দেনা করেছিলেন, তা প্রায় কিছুই শোধ দিয়ে যেতে পারেন নি। ওর দুটি দাদাই চাকরীতে ঢুকেছে বটে কিন্তু তাদের আর আয় কি? এরই মধ্যে ওর বড় ভায়ের বিয়ে দিতেও হয়েছে—তারও ছেলেমেয়ে হ'য়ে গেছে দু-তিনটি।

অর্থাৎ সংসারে টানাটানি বেড়েই গেছে, কমেনি একটুও।

সুতরাং এর ভেতর মায়ার বিয়ের কথা তুলবে এমন পাগল কে আছে!

মা এক আধদিন বড় ছেলের কাছে কথাটা পাড়বার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু সাহস ক'রে বেশী দূর এগোতে পারেন নি। সে চোখ পাকিয়ে জবাব দিয়েছে: 'তুমি থামো! এক বোনের বিয়ের দেনা আগে শোধ করি, তবে ত আর এক বোনের বিয়ের কথা ভাববো! তোমার লজ্জা করে না একটু, ওকথা মুখে আনতে! আমার মাথার উপর একটি আইবুড়ো বোন আর একটি বোনের বিয়ের দেনা চাপিয়ে তিনি ত সরে পড়লেন! আমরা কার ওপর চাপাব বলো?'

তবু হয়ত অনেক সাহসে ভর ক'রে এবং উদ্গত অশ্রু সম্বরণ ক'রে মা বলতে চেষ্টা করেছেন, 'না—এখন থেকে খোঁজ-খবর করলে হ'ত। বর চাইলেই যে তখুনি পাওয়া যাবে এমন ত কোন কথা নেই।'

'কিন্তু পাবার জন্যেই ত লোকে খোঁজ-খবর করে। যদি ধরো পাওয়া যায়—ধরো কেউ ওকে পছন্দ করলে—তখন কী করব? টাকাটা আসবে কোথা থেকে। না মা ওসব ধাষ্টোমো আমাদের দ্বারা চলবে না। আমাদের একটি আত্মসম্মান-বোধ আছে!'

অগত্যা এখানেই ইতি।

মায়া সংসারে উদয়াস্ত খাটে। প্রতিদিনের চা জলখাবার করা, বিছানা-মাদুর তোলা, যাবতীয় সেলাইয়ের কাজ, রান্নার জোগাড় দেওয়া—কখনও কখনও মা'র অসুখ করলে রান্নাবাড়া করা—ভাইপো-ভাইঝিদের নাওয়ানো খাওয়ানো,—ইত্যাদি সহস্র কাজের মধ্যে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল সে যে, তাকে যে কোনদিন

বিয়ে দিয়ে পরের বাড়ী পাঠাতে হবে, এই বাঁধা জীবন-যাত্রায় আসবে পরিবর্তন—তা কেউ ভাবতেই পারে নি। লেখাপড়া ত ওর বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু অর্থাভাবে ততটা নয়, যতটা সময়াভাবে। একটি ঠিকে ঝি আছে শুধু বাসন মেজে দিয়ে যায়, তার বেশী খরচ করার সামর্থ্য নেই এদের, বাকী সব কাজই নিজেদের ক'রে নিতে হয়। মা'র শরীর অপটু হ'য়ে আসছে দিন দিন, শুধু বসে বসে রান্নাবান্না করা ছাড়া আর কোন কাজই করতে পারেন না। বৌদির কোলে ছোট ছেলে, একটি না একটি থাকেই—সুতরাং মায়া ছাড়া গতি কি? মায়া এ সংসারেরই অঙ্গ, তার কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছে—একথা কেউ কল্পনাই করতে পারে না।

আর কেউ পারে না বলেই বোধহয় কাজটা মায়াকে নিজেই করতে হয়।

একদিন সে দাদা অরুণের শ্রুতিসীমার মধ্যেই মাকে শুনিয়ে বলে, 'মা—এখানে শুনেছি নারী কর্ম-মন্দিরে দুপুর বেলা মেয়েদের নানারকম হাতের কাজ শেখানো হচ্ছে। আমি মনে করছি ভর্তি হবো! দুপুরে অতটা কাজ থাকে না,—ঘণ্টা-দুই সময় ক'রে নিতে পারা যাবে!'

মা উত্তর দেবার আগেই অরুণ কথা কইলে। সে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল, হঠাৎ ক্ষুরটা নামিয়ে বললে, 'তার মানে?'

'যা হয়, কিছু একটা করতে হবে। মা-আর কদিন? চিরদিন কি আর ভাই খেতে দেবে? লেখাপড়া শিখলুম না—কিছু একটা কাজ শিখ্‌তে হবে ত।'

'ওমা, তাই ব'লে—' এবার মা-ই কথা বলেন, 'তাই ব'লে

অত বড় সোমত্ত মেয়ে কোথায় কী কাজ শিখতে যাবি? আজ বাদে কাল বিয়ের সম্বন্ধ করতে হবে—শেষে কি একটা ভাংচি পড়বে?'

'আঃ। ওসব থাক্‌না মা। বিয়ে যে হওয়া আমার সম্ভব নয় তা তুমিও জানো, আমিও জানি। এরপর কিছু একটা শেখারও বয়স থাকবে না। তুমি মারা গেলে ধরো যদি বৌদিদের সঙ্গে না-ই বনে—তখন বাড়ীর বাইরে গিয়ে দাসীবৃত্তি করতে হবে ত?'

বৌদি ওপাশ থেকে ফিস্ ফিস্ করে অরুণকে বললে, 'হ'ল ত! কবে থেকে বলছি যে বোনের একটা গতি করো। এবার নিজে মুখে নোটিশ দিলে ত! অত বড় বোন থাকতে মানুষ কেমন ক'রে নিশ্চিন্তি হয়ে বসে থাকে তা বুঝি না!'

অরুণ গম্ভীরভাবে বললে, 'নিশ্চিন্ত কেউই থাকে না। কিন্তু চিন্তা করা ছাড়া যে আর কিছুই করবার নেই, তা ভুলে যাচ্ছ কেন? আমাদের ত এই অবস্থা—টাকা ছাড়া কি আর বোন পার হবে? বাবা ত একরাশ দেনা ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেন নি—পার করব কি দিয়ে? তবু ত নিজে দুটো টিউশ্যানী করছি। ভোলাটা যদি আর কিছু বেশী দিত, তাহ'লেও এতদিনে দেনা খানিকটা হালকা হ'য়ে আসত। বাবু ত ঐ অফিসে যাওয়া আসা ছাড়া আর কিছু করবেন না—সকাল সন্ধ্যে আড্ডা আর আড্ডা।'

বৌদি বললে, 'তা বাপু এত বড় বোন থাকতে তোমার নিজের বিয়ে করা ঠিক হয় নি! জানই ত আরও জড়িয়ে পড়বে।'

'সে ঐ মাকে বলো গে। উনিই তখন সংসারে লোক না এলে চলবে না—ব'লে ক্ষেপে উঠেছিলেন একেবারে।...আমি কিছু বিয়ে পাগল হয়ে তোমাকে বিয়ে করতে ছুটি নি।'

দাম্পত্য বাদানুবাদটা হয়ত কলহেও পরিণত হ'তে পারত কিন্তু মায়া সে সুযোগ দিলে না! সে শান্ত কণ্ঠে মাকে বললে, 'আমি কিন্তু এখনও আমার কথার জবাব পাই নি মা।'

এবার অরুণ প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, 'না না—ওসব কিছু করতে হবে না। বিয়ের চেষ্টাই দেখা হচ্ছে। আমি কি আর ভেতরে ভেতরে কোন খোঁজ-খবর করছি না? এধারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে করব ভাবছিলুম ব'লেই না—তা সে দেখছি আমারই অপরাধ হয়েছিল। থাকার মধ্যে ত এই বাড়ীটুকু। ভাঙ্গা পুরোনো বাড়ী—কীই বা দাম। তবু মাথা গোঁজবার জায়গা বলেই এতকাল এদিকে তাকাই নি। তা তাই না হয় যাক্—বাবার বাড়ীর বদলে তাঁর মেয়ে পার হোক্। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তা হবে। সত্যিই ত—আফ্‌টার অল, আমিই ত বিয়ে করেছিলুম, নিজের কোমরের জোর বুঝেই করা উচিত ছিল! ঘরের মেয়ে থাকতে পরের মেয়ে পার করতে যাওয়া ঠিক হয় নি।'

অরুণ অনেক্ষণ ধরে গজগজ করতেই থাকে। স্ত্রী পর্যন্ত যদি তাকে ভুল বোঝে ত সে যায় কোথায়?

কিন্তু সে-ও কয়েক বছরের কথা হয়ে গেল বৈকি!

ইতিমধ্যে খোঁজ-খবর হয়েছে, ঘটক লাগানো হয়েছে, কলকাতার দু-দুটো বিবাহ অফিসে নাম লেখানো হয়েছে—দু-চার দল এসে দেখেও গেছেন। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নি। মায়ার রং হয়ত এককালে ফর্সাই ছিল কিন্তু আজ আর তা কল্পনা করাও কঠিন। দেহের কান্তি কমনীয়তা গঠন-পরিপাট্য—এসব কোন্ সুদূরের কথা তা ওর মারও মনে পড়ে না। রোগা হাড়বার-করা

দেহ, ফাটা পা, শির ওঠা রুক্ষ হাত এবং কেশ বিরল মাথায় টাসল্ দেওয়া কবরী—এসব সত্ত্বেও যদি বা কোন পুরুষ অভি-ভাবকের পছন্দ হয়, বাড়ীর ওঁয়ারা দ্বিতীয়বার দেখতে এসে 'না' ক'রে দেন। ইদানীং তাই মায়া বেরোতে চায় না, কান্নাকাটি করে। বলে, 'কী হবে মিছিমিছি গাল বাড়িয়ে চড় খেতে গিয়ে মা? আমার আর এ অপমান সহ্য হয় না।'

মা বলেন, 'একেবারে যে কেউ পছন্দ করছে না তাও ত নয়। এমনি ক'রেই হবে ঠিক একদিন। কী করব মা বল, সবই তোর অদৃষ্ট, নইলে সে মানুষটাই বা এত তাড়াতাড়ি যাবে কেন বল?'

সত্যিই যে একেবারে কেউ পছন্দ করে নি তা নয়। দু-তিন দল এর ভেতর এসে পছন্দ ক'রে গিয়েও ছিল। কিন্তু তারপর আর কথা এগুতে পারে নি। হয় তাদের অত্যধিক খাঁই...নয় ত এদেরই ছেলে পছন্দ হয় না। দু-দুটী পাত্রকে মেজ-ভাই ভোলা নাকচ ক'রে দিয়েছে। দু-জায়গাতেই আপত্তি উঠেছে তাদের অবস্থায়। ভোলা বলেছে, 'ঐ ত আয়! বিয়ে ক'রে নিজেরাই বা কি খাবে আর ছেলেমেয়েদেরই বা কি খেতে দেবে? না না—ওসব পাত্তর চলবে না।'

মা তবু একবার ক'রে মনে করিয়ে দেন হয়ত— 'বাইরে যাই বলি না কেন—এধারে যে সাতাশ বছর বয়স হয়ে গেল সেটা হুঁশ আছে?'

'তা বলে কি হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে হবে নাকি? এখন এক জ্বালা, সে যে তখন শতেক জ্বালায় জ্বলতে হবে। মাসে মাসে এসে ভায়ের বাড়ীতেই হাত পাততে হবে হয়ত। মাথা

গোঁজবার জায়গা নেই— ঈশ্বর না করুন যদি অসময়ে চোখ বোজে-ত ছেলেমেয়ে নিয়ে আবার এখানেই এসে উঠতে হবে, তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাক। এতদিনই গেল যখন—'

সুতরাং কিছুই হয় না।

একের পর এক—দিন মাস বৎসর কেটে যায় শুধু। আরও কর্কশ হয় মায়ার গায়ের চামড়া। আরও কিছু চুল উঠে যায় শুধু। আরও এক পোঁচ কালি পড়ে দেহে।

অবশ্য একেবারে যে কিছুই হয় না তা বলা শক্ত। ইতিমধ্যে কোথায় এক জায়গায় বরযাত্রী নিমন্ত্রণে গিয়ে ভোলা একটি বিয়ে ক'রে নিয়ে এল। মন্দ লোকে বললে সবটাই সাজানো, এত বড় আইবুড়ো বোন থাকতে বিয়ে করতে চক্ষু লজ্জায় বাধছিল তাই। কেউ বললে, জানাশুনো ভাবসাবের বিয়ে। মা কপাল চাপড়ালেন খানিকটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বউ বরণ ক'রে ঘরে তুলতে হ'ল। বাড়ী তারও পৈত্রিক। বিয়ে করার অধিকারও তার আছে। তাছাড়া পাল্‌টি ঘরেই বিয়ে করেছে—আপত্তি করারও কিছু নেই।

মায়ার মুখ কঠিন হয়ে উঠল বটে কিন্তু তাকেও শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাসিমুখে আলাপ করতে হল। হাসি তামাসাও করতে হ'ল।

শুধু রাত্রে ওর বৌদি অরুণকে মনে করিয়ে দিলে, 'আরও নাকে শর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও। যত দায় ত তোমারই। উনিও বিয়ে ক'রে এসে বসলেন, মাসে মাসে যে ষাট টাকা দেন, তার বেশী কি আর এক পয়সাও দেবেন মনে করছ? খরচাই বাড়ল, আয় বাড়ল না। এতদিনে বোনের বিয়ে দিতে পারলে না—এর পর দেবে কি ক'রে? বছর না ঘুরতে ত বাচ্চা আসবে একটি

—খরচ-ত বাড়তেই থাকবে দিনের পর দিন।'

অরুণ রাগ ক'রে বলে, "টাকা যদি ভোলা না বাড়ায়, ওঁদের আলাদা ক'রে দেব—এই স্পষ্ট বলে দিলুম তোমায়।'

'খুব বুদ্ধির কাজ করবে? টাকাটাই কমে যাবে—তোমার খরচা কতটুকু কমবে? এখনও দুটো ভাই পড়ছে—সে সব খরচ কি মেজ ঠাকুরপো দেবে? তোমার ঘাড়ে চাপ্‌বে।'

'তাই ত। বড় খোকাটাকে বললুম দিই অফিসে ঢুকিয়ে, তুমিই ত তখন না করলে! কলেজে পড়ার খরচ কি কম?'

'সে ত বাপু নিজে টিউশ্যানী ক'রেই চালাচ্ছে। অত ভাল ক'রে পাশ করলে—দু-দুটো ভাই তোমরা মাথার ওপর—না পড়ালে নিন্দেয় দেশ ছেয়ে যেত যে।'

কথাটা সেইখানেই চাপা পড়ে যায়। গত কয়েক বছর ধরেই এইভাবে চাপা পড়ছে। অতএব ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে বৈকি।

ভোলার বিয়েটা খুব আকস্মিকভাবে হয়ে গিয়েছিল ব'লে ওর দিদি আসতে পারে নি। সে থাকে সেই শিলিগুঁড়িতে—আজ-কাল আসা-যাওয়ার হাঙ্গামাও ঢের। যাই হোক্—মাস-দুই পরে সে একদিন স-পুত্র-কন্যা এসে হাজির হল।

প্রথম মিলনের কোলাহল থেমে যেতেই রান্নাঘরে নিভৃতে গিয়ে মাকে প্রশ্ন করলে মালতী, 'হ্যাঁ মা, মায়ার বিয়ের কী করছ? আর যে চাওয়া যাচ্ছে না।'

মা বললেন, 'বেশ বলেছ মা, বড় বোনের উপযুক্ত কথাই বলেছ। মাথার ওপর বড় বড় ভাই উপযুক্ত ভগ্নিপতি থাকতে

আমি বুড়ো মা পথে পথে ঘুরে জামাই খুঁজবো—না?'

মালতী খানিকটা চুপ ক'রে থেকে একটু গলা নামিয়ে বললে, 'পাত্তর একটি আছে মা। আমারই মামা-শ্বশুর হয়—খুব দূর সম্পর্কের। আমেদাবাদে চাকরী করে, ষোলশ টাকা মাইনে, ওখানে বিরাট বাড়ী আছে, গাড়ী আছে। বৌ মরেছে বছর-তিনেক হল। এক ছেলে, তা সেও কি কাজকর্ম শিখে দিল্লীতে চাকরী করছে, ভাল চাকরী। ভাবসাব ক'রে সে সেখানে বিয়েও করেছে একটা। তাইতেই মামা খুব ঘা খেয়েছেন। এতদিন বিয়ে করব না ব'লে বসেছিলেন—এখন বলছেন যে ডাগর ডোগর মেয়ে পেলে করবেন। নইলে বুড়ো বয়সে দেখবে কে?'

তরঙ্গিণী গালে হাত দিয়ে বললেন, 'ওমা অত বড় ছেলে বলছিস; তার বয়স কত?'

'বয়স একটু হয়েছে মা—তা আটচল্লিশ হবে কিন্তু অত দেখায় না।'

'সে যে বুড়ো বর, বুড়ো বরে দেব?'

'তোমার মেয়ের বয়সের হিসেবটা একবার করো মা। আটাশ বছরের মেয়ে—চল্লিশের কম বরের বয়স হলে ত মানাবেই না।'

তরঙ্গিণী তবু সংশয়ের সঙ্গে বললেন, 'কী জানি মা, প্রথম হ'লেও না হয় হ'ত। একে বয়স হয়েছে তায় অত বড় ছেলে—মেয়ে কি মনে করবে, এতকাল পরে এই বিয়ে দিলে?...তবে ছাখ্—না হয় অরুণকে বল। আমার মতামতের আর মূল্য কি?

মালতী তখনই অরুণের খোঁজে গেল। অরুণ আর ভোলা বড় ভগ্নিপতির সঙ্গেই বসে গল্প করছিল। কথাটা শুনে অরুণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভগ্নিপতির মুখের দিকে তাকালে। তিনি একটু

চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'না মেজমামার অবস্থা অবশ্য খুবই ভাল। মাইনে ছাড়াও প্রোডাক্শনের উপর জোড়া পিছু এক পয়সা ক'রে কমিশন পান। কম্‌সে কম পাক্কা দুটি লাখ টাকা জমিয়েছেন।…বয়স সত্যিই এমন কিছু দেখায় না—রোবাস্ট হেল্‌থ, কিন্তু সে কথাটা বলেছ ওদের?' বলে একটা ইঙ্গিত করেন তিনি।

মালতী মাথাটা ঈষৎ নীচু ক'রে বলে, 'না, কথাটা ত এই উঠল। এমন কিছু নয়—একটা য়্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল, বাঁ হাতটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। তা কাজকর্ম ত সবই করছে। আর ধরো বিয়ের পরই যদি হ'ত তাহ'লে কী করতে?'

এবার ভোলা ফেটে পড়ল।

'দিদি তোমার নিজের ভাল বিয়ে হয়েছে বলেই বুঝি বোনের জন্যে এমন সম্বন্ধটা পাড়তে পারলে! তোমাকে সৎপাত্রে দিতে গিয়ে বাবা যদি সর্বস্বান্ত না হতেন ত মায়ার বিয়ে আমরা অনেকদিন আগেই দিতে পারতুম। ছোট বোনের ওপর তোমার খুব টান—বোঝা গিয়েছে, ধন্যবাদ।…দোজবরে, বুড়ো—তার ওপর হাতকাটা নুলো—বলিহারী পাত্র। অমন বরে দেওয়ার চেয়ে বোনকে দড়ি কলসী কিনে দেব, সেও ভাল।'

মালতীর চোখে জল এসে গেল। ভগ্নিপতি ঘাড় হেঁট ক'রে বসে রইলেন। তরঙ্গিণীরও লজ্জার সীমা রইল না। কিন্তু কেউ কিছু বলবার আগেই আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। মায়া যে কাছাকাছি থাকতে পারে—এদের কারুরই সে কথাটা মনে ছিল না। সে কাছেই ছিল। খুবই কাছে। একটু আগে রান্নাঘরের বাইরে থেকে সবই শুনেছে, এখনও এ ঘরের বাইরেই সে দাঁড়িয়েছিল। কে জানে, মালতীর এই মামাশ্বশুরের কাহিনী শুনতে

শুনতে তার মনে বহুদূর অতীতের এক সন্ধ্যাবেলায় চলে গিয়েছিল কি না। সেখানে হয়ত আজও ডবল-উইকের টেবিল ল্যাম্পের আলোতে দাঁড়িয়ে আছে হীরের টায়রা, মুক্তোর কলার আর চুণী-পান্নার নেকলেস পরা এক অপরূপ নারীমূর্তি—

অকস্মাৎ সে বাইরে থেকে মাকে ডেকে স্পষ্ট ক'রেই বললে, 'মা দিদিকে বলো ঐ সম্বন্ধ এখনই চিঠি লিখে পাকা ক'রে ফেলতে। অবিশ্যি তিনি যদি দয়া ক'রে নিতে রাজী হন। এখানে বিয়ে না হ'লে আমাকেই দড়ী কলসী খুঁজে নিতে হবে মা। ভাইদের কত দরদ আর কত যে মুরোদ তা এই ক-বছরে বেশ বুঝে নিয়েছি।'

কেষ্টর মা যে কোনদিন সমস্যা হয়ে উঠবে তা এতকাল কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাইত হ'ল।

বোসেদের বর্তমান যাঁরা কর্তা, এঁদের পিতামহ রায় সাহেব অনুকূল বোস যখন এই বাড়ীটি প্রথম করেন তখন থেকেই কেষ্টর মা এখানে আছে। অনুকূলবাবুর স্ত্রীর বাপের বাড়ী ধাত্রীগ্রামে। কেষ্টর মারও বাপের বাড়ী। তাঁর বাপের বাড়ীতেই কেষ্টর মার মা—অর্থাৎ কেষ্টর দিদিমা কাজ করত। সেই সুবাদেই জানা-শুনো। কেষ্টর মার নামটাই কিন্তু সব—অর্থাৎ কেষ্ট বা বলরাম, কোন ছেলেই কখনও ওর হয়নি। কেষ্টর মা যখন প্রথম এ বাড়ীতে কাজ করতে আসে তখন অনুকূলবাবুর স্ত্রী সুবালা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী বলে তোকে ডাকব রে? তোর নাম কি?'

তখন বিষম বিব্রত হয়ে পড়েছিল সে।

'ওমা, নাম? মায়ের যা কাণ্ড! এক নাম যা রেখেছে তা' ত বলবার উপায় নেই। আবার নিজে ডাকে খুকী বলে—সেই বা লোকে কী মনে করবে? তা তোমরাই যা হয় একটা ঠিক ক'রে দাও না বাপু!'

'সে কী রে!' সুবালা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোর নাম আমরা ঠিক ক'রে দেব। কেন, তোর নামটা কি তাই শুনি না।'

'সে কথা আর ব'ল না। মা নাম রেখেছিল চারু।'

'বেশ ত, চারু বলেই ডাকব না হয়।'

'না না—বাপু, সে আমার বড্ড লজ্জা করবে। তার চেয়ে

তোমরা বরং কারুর মা ব'লেই ডেকো।'

'না বিইয়ে কানাইয়ের মা!' সুবালা হেসে বলেছিলেন, 'তা মন্দ নয়, তোকে আমরা কেষ্টর মা ব'লে ডাকব।'

তখন ঝিকে নাম ধরে ডাকার রেওয়াজও ছিল না, ছেলে বা মেয়ের পরিচয়েই লোকে ডাকত। সুতরাং এই ব্যবস্থাই সকলের কাছে সহজ ব'লে মনে হ'ল।

সেই থেকেই কেষ্টর মা এ বাড়ীতে আছে।

আর কখনও দেশে যাবার দরকার হয়নি—একবার ছাড়া। সে শুধু যেবার ওর মা মারা যায়। গিয়ে যা কিছু ছিল বেচে-কিনে শ্রাদ্ধশান্তি ক'রে চলে এসেছিল। ওর তিনকুলে কেউ ছিল না—থাকলেও কেষ্টর মা তাদের কখনও আমল দেয়নি। ছেলেপুলে ওর হয়নি—হবার সুযোগও মেলেনি। দু'বার বিয়ে হয়েছিল ওর। প্রথম বিয়ে হয়—তখন ওর সাত বছর বয়স। মাস কতকের ভেতরই কলেরায় ওর সে বর, শ্বশুর, দেওর সব শেষ হয়ে যায়। তারপর দশ বছর বয়সের সময় আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখে ওর মা। বৈষ্ণবমতে কণ্ঠিবদল হয় আর একটি ছেলের সঙ্গে—কিন্তু সেও ওর কপালে টিকল না। মাঠে কাজ করতে করতে সাপে কাটল তাকে। তখন ওর সবে বারো পূর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় বারও শাঁখা-রুলি খুলে বাপের বাড়ীতেই এসে উঠতে হ'ল। মা তাতে অসুবিধা বোধ করেনি তত। মায়ে-বেটিতে মিলে কাজে যেত—তিন বাড়ীর কাজ সকালে এক প'র বেলার মধ্যেই সেরে ফেলত। মেয়েকে চোখের আড়াল করতে দেবে না বলে—যে ক' বাড়ী কাজ করত, একসঙ্গেই যেত, হাতাপিতি ক'রে একসঙ্গেই সারত। কিন্তু বছর কতক পরে দেখা গেল

যে তাতেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না।

কেষ্টর মা নামের উপযুক্ত রকম ভাবেই কৃষ্ণবর্ণ ছিল—তবু তারও প্রণয়প্রার্থীর অভাব হ'ল না। আঠারো উনিশ বছর বয়সের একটা মোহ আছে—কেষ্টর মাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল একটু। সেই সময়ই তার মার কানে খবরটা পৌঁছল রায়েদের মেয়ে সুবালার বর খুব বড় চাকরী করছে আজকাল, দিল্লী থেকে বদলী হয়ে কলকাতায় এসেছে, বাড়ীও করেছে নিজে। ঠিকানাটা রায়েদের বাড়ী থেকেই যোগাড় হয়ে গেল। তারপর সে একদিন মেয়েকে সঙ্গে ক'রে এসে সুবালার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল, 'এই তোমার কাছে গচ্ছিৎ ক'রে দিয়ে গেলুম, মেজদি'মণি, মারো-কাটো, ফাঁসি দাও—যা করো করো---বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিওনা কোনদিন। খাবে-দাবে থাকবে---আজ থেকে ও তোমাদেরই মেয়ে। আমি আর ক'দিন বলো?'

মেয়েকেও শাসন ক'রে গেল, 'খবরদার, এ বাড়ীর চৌকাঠ কোনদিন ডিঙ্গুবিনি।'

তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে।

সুবালা গেছে, অনুকূলবাবু গেছেন। অনুকূলবাবুর তিন ছেলের ভেতর একজন ছেলেবেলাতেই গিয়েছিল—বাকী দু'জন কেষ্টর মার চোখের সামনেই বড় হয়েছে, চাকরী পেয়েছে, বিয়ে-থা করেছে। তাদের ছেলেপুলেতে বাড়ী ভরে গেছে। তারা বড় হয়েছে, বিয়ে-থা করেছে। তাদের ছেলেপুলে হয়েছে। অনুকূলবাবুর ছেলে দুটির একজনও নেই। এমন কি তাঁদের স্ত্রী-রাও গত হয়েছেন। তাঁদের ছেলেরাই আজ পরিণতবয়স্ক।

অর্থাৎ বহু বৎসর কেটে গেছে কেষ্টর মারও জীবনে। কিন্তু-সে হিসেব সে রাখে না।

কত বয়স তার? ষাট সত্তর, আশি? একশ'?

'কে জানে! কত বছর। আমি কি ছাই অত হিসেব রেখেছি! তবে সে অনেকদিন; এই ছ্যাখো না, তখন মেজো মেসোমশায় বেঁচে, চাকরী করছেন। সে কতকাল হ'ল গা?—'

এইভাবেই হিসেব গুলিয়ে যায়।

এতকাল কেষ্টর মা একা এই বাড়ীর সব কাজ করছে। ধোয়া-মোছা, বাসনমাজা, বাটনাবাটা, জলতোলা, মায় ছেলেমেয়ে দেখা পর্যন্ত? চাকর শুধু বাইরের ফায়-ফরমাশ খাটৃত আর বাজার করত। কেষ্টর মা কোনদিন কোন কারণেই একা বাড়ীর বাইরে বেরুত না। এ বিষয়ে সে মার অনুশাসন মেনে চলত অক্ষরে অক্ষরে। গ্রহণে স্নান করতে বা কালীঘাট যাবার সময় গৃহিণীরা কেউ সঙ্গে নিয়ে গেলে তবে যেত। কিন্তু সে পাটও উঠে গেছে আজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর। এখনকার যাঁরা গৃহিণী ওসব ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ কম—তাছাড়া গেলেও, কে ঐ চরচরে অনাত্মীয় বুড়ীকে টেনে নিয়ে যাবে?

কেষ্টর মা কখনও মাইনে পায়নি এ বাড়ী থেকে। সুবালা যতদিন বেঁচেছিলেন তিনি বলতেন, 'তোর সব খরচ ত আমরাই দিচ্ছি, মাইনে নিয়ে তুই করবিই বা কি? বরং যদি কখনও তীর্থধর্ম্ম করতে ইচ্ছে হয় ত বলিস—সেই সময় কিছু টাকা দেব।'

কর্তার কাছে বলতেন, 'আমরা ত' ঝি রাখতে যাইনি—ওর মা-ই গছিয়ে দিয়ে গেছে। মাইনে দেবার অত গরজ কি আমাদের? যদি কোনদিন চোখ-কান ফোটে, চায়—ত দেখা যাবে!'

সে চোখ-কান কেষ্টর মার কোন দিনই ফোটেনি। তার বহু আগেই সুবালা চোখ বুজেছেন! ছেলেরাও—খাতায় কোন খরচা লেখা ছিল না ব'লে ও প্রসঙ্গ তোলেনি। মাইনের কথা ওঠেইনি কোনদিন।

খায়—কাপড় ছিঁড়লে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে না শুনিয়ে সাধারণভাবেই চেঁচিয়ে বলে, 'ত্ব'খানা কাপড়ই ন্যাতাকানি হয়ে গেল বাবুরা, বুড়ীর একটা কাপড় চাই।' খরচের ভেতর একটু আফিং খাওয়ার অভ্যাস আছে। সেটা এঁরা দিতে খুব আপত্তি করেন না—বাজারবেলায় বাজারের খরচ থেকেই সেটা এসে যায়।

আলাদা কোন টাকার দরকার আছে, কেষ্টার মাও কোনদিন ভাবেনি। এমন কি বিয়ে-থা শুভকর্মে বাড়ীর অন্য ঝি-চাকর যখন বক্‌শিশ আদায় করত---কেষ্টর মা তখনও কোনদিন কিছু চায়নি। সে নিজেকে এ বাড়ীর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই ভাবত। ঝি বলে কখনও ভাবেনি। সে আশা করতো যে এরাও তাই ভাবে।

কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। বেশিদিন বাঁচারও সীমা থাকা দরকার। কেষ্টর মা সে সীমা লঙ্ঘন ক'রে গেছে। তাকে দিয়ে কোন কাজই হয়না আর—অথর্ব হয়ে বেঁকে পড়েছে। অথচ ত্ব'বেলা খাওয়া-পরা, আফিং—সব খরচই আছে। সিঁড়ির নিচের ফালি ঘরটাও সে দখল ক'রে থাকে। আগে সে ওপরেই শুত ছেলেমেয়েদের ঘরে---ক্রমে ঘরের অভাব হওয়ায় এসে ঐখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে সেখান থেকে নড়ানো যায় না। অথচ অন্য ঝি-চাকরদেরও থাকার কষ্ট। তাছাড়া বড্ড খিটখিট করে ঝিয়েদের সঙ্গে। যেন ঐ-ই গিন্নী। বললেও শোনে না। পাগল

ব'লে, ভীমরতি ব'লে তারা ক্ষমা করে কিন্তু তাই বা কত সহ্য করবে তারা ?

তবু সমস্যাটা এতকাল খুব প্রকট হয়ে ওঠেনি—একান্নবর্তী সংসার ছিল ব'লে।

কিন্তু আর তা রাখা সম্ভব নয়।

দোতালা বাড়ীকে তেতালা করলেও ঘর তিনখানার বেশী বাড়ানো যায়নি। এদিকে ছেলেপুলে নিয়ে মোট অধিবাসীর সংখ্যা বর্ত্তমানে ছাপ্পান্নটি। কিছুতেই, কোনমতেই এই স্থানে কুলোবার কথা নয়। বিশেষত এগারোটি যেখানে দম্পতি!

তাছাড়া বনিবনাও হচ্ছে না দীর্ঘকাল থেকে। টাকাকড়ি কে কত দেবে—এ নিয়ে প্রতি মাসেই শেষের দিকে কলহ। সকলেই এখন পৃথক হ'তে ব্যগ্র। এ বাড়ী ভাগ ক'রে থাকা সম্ভব নয়। প্রথমত ছুটো ভাগ হবে, সেই অর্দ্ধেক ছুটির একটি হবে চার ভাগ, একটি পাঁচ ভাগ। শেষ ভাগে একটা ক'রে ঘরও পড়বে না। কী হবে ভাগ ক'রে?

সেজবাবু শ্বশুরের বিষয় পেয়েছেন, নগদ টাকাটা পেলেই তিনি সরে পড়েন। মেজবাবু বেহালা অঞ্চলে জমি কিনেছেন অনেকদিন, ভাগের টাকাটা হাতে পেলে বাড়ীতে হাত দিতে পারেন। বড়বাবুর ছুটি যমজ মেয়েই বিবাহযোগ্যা—তাঁর ও একখানা ঘরের ভাগে কুলোবেও না—তাছাড়া বাড়ী মাথায় থাক্, মেয়েদের বিয়ে আগে। এমনি প্রত্যেকেরই ঝোঁক বাড়ী বেচার দিকে। এক ছোট কর্ত্তা নিতে পারতেন সব বাড়ীটাই, যুদ্ধের বাজারে ছু'পয়সা করেছেন কিন্তু তিনিও তাতে রাজী নন্। বলেন যে, 'আমি যত দামই দিই না কেন মনে ভাববে আপনার লোক বলে ঠকালে।

আর মুখে বলবে যে, তা যাক্‌গে---তবুত নিজেদের মধ্যেই রইল। তারপর হয়ত তখন বাড়ী ছাড়বার তাগাদা থাকবে না। যাক্‌ ---তারচেয়ে সোজাসুজি পরেই যাক।'

সুতরাং—

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দালাল লাগিয়ে একদা বিক্রী ক'রে দেওয়া হ'ল। সাড়ে বাহান্ন হাজার টাকা দর উঠল—হয়ত আরও বেশী ওঠা উচিত ছিল কিন্তু বাবুদের ধৈর্যের অভাব।

এইবার সাজ সাজ রব উঠল।

বাড়ী ভাড়া ক'রে রেখেছিলেন কেউ কেউ আগে থাকতেই, কেউ-বা এখনই খোঁজ-খবর ক'রে নিলেন। ছোট বাবুই কেবল বাড়ী কিনে নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন। এইবার প্রশ্ন উঠল, বুড়ীকে কে নিয়ে যাবে?

কেউই ঘাড় পাতে না।

এমন কি প্রশ্নটাও এড়িয়ে যায়।

সকলেই যেন সকলের আগে সরে পড়তে চান, তার মূলেও ঐ বুড়ী।

এ প্রশ্ন উঠবে, তা সবাই জানে—ওঠবার আগেই সরে পড়তে চায় তাই।

মেয়েদের ভেতর যাকে প্রশ্ন করা হয়, সে-ই জবাব দেয়, 'তা কী জানি ভাই!...আমারা ত ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে যাচ্ছি, ওকে রাখবই বা কোথায়, দেখবেই বা কে? একটা ঝি রাখারই সাধ্যি থাকলে হয়। ওকে নিয়ে গেলে ত ওর পেছনে একটা লোক চাই।...সে সব দিনকাল যখন ছিল তখন পোষা গেছে। এখন আমাদের কি আর সে ক্ষমতা আছে।...যাবে কারুর সঙ্গে শেষ

পর্যন্ত। পড়ে কি আর থাকবে?' দায়িত্বটা এড়িয়ে যায়।

ছোট কর্তাই নিজের বাড়ীতে গেলেন; তাঁর স্থানাভাবের প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু তিনিই সর্বাগ্রে চলে গেলেন। তখন প্রশ্নটা অত উগ্র হয়ে ওঠেনি।

শেষে বড়বাবু তাঁর অফিসে টেলিফোন করলেন, 'কি করবে হে কেষ্টর মার?'

'তা আমি কি বলব দাদা? আপনারা যা ভাল হয় করুন। ওর দেশঘাট কোথায়? সেখানে কেউ নেই? এসে নিয়ে যাক্‌না!'

'বিলক্ষণ! সাত কাণ্ড রাময়ণ সীতে কার পিসেমশাই। ওর আবার এতদিন পরে কে কোথায় গজাবে? শুনেছি ঠাকুমার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। সেখানে কেউই নেই বোধহয়। আমি ত এই বায়ান্ন বছর বয়সে একদিনও ওকে কোথাও যেতে দেখিনি, ওর কাছেও কেউ আসেনি। কেউ থাকলে কি কখনও শোনা যেত না।'

টেলিফোনের ও প্রান্ত নীরব রইল বহুক্ষণ। শেষে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর এল 'তা কী জানি। দেখুন আপনারা ভেবে। আমি কিছু করতে পারব না। পূর্ব পুরুষের folly-র বোঝা টেনে বেড়ানো আমার কাজ নয়!'

ঠুং ক'রে রিসিভার রাখার শব্দ হ'ল। লাইন কেটে গেল। বড়বাবু ব্যাপারটা অমীমাংসিত রেখেই নিজে একদিন সরে পড়তে বাধ্য হলেন। তাঁর কন্যাদায়—ছোট ফ্ল্যাট নিতে বাধ্য হয়েছেন। ছেলেপিলেও বেশী তাঁর। তাঁর পক্ষে এসব বিবেচনা সম্ভব নয়।

এমনি ক'রে সবাই সরে যেতে যেতে শেষ যাঁরা থাকলেন —সেজবাবু আর রাঙাবাবু, তাঁরাই পড়লেন ফাঁপরে।

সত্যিই আর কিছু জ্যান্ত মানুষটাকে টেনে ফেলে দেওয়া যায় না! অথচ নিয়েই বা যেতে চায় কে—এই ক্ষেত্রে।

শেষে রাঙাবাবুর সম্বন্ধী খবর আনলেন, কোথায় যেন একটা অনাথ আশ্রম আছে। সেখানে গোটা কতক টাকা দিলে তারা ভার নিতে রাজী আছে।—'তোমরা ন'ভাই একটা ক'রে টাকা দিলেই ন-টাকা। ছোট কর্তা হয়ত একটা টাকা বেশীও দিতে পারে—তাহলেই দশ টাকা হবে। মাসিক দশ টাকা দিলেই হবে।'

সেজবাবু ভাইদের অফিসে অফিসে ছুটোছুটি ক'রে প্রথম মাসের টাকাটা তুললেন। রাঙাবাবুর সম্বন্ধী গিয়ে টাকাটা জমা দিয়ে এলেন। এখন একটা রিক্সা ডেকে ওকে নিয়ে যাওয়ার ওয়াস্তা!

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রাঙাবাবুর।

কথাটা বুঝতে কেষ্টর মার সময় লাগল বহুক্ষণ। সে কেবলই ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তার ঘোলা দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে আর মধ্যে মধ্যে বিড়বিড় ক'রে বকে। শেষে অনেক কষ্টে যখন এই-টুকু বুঝলে যে তাকে বাইরে যেতে হবে—তখন সোজাসুজি বেঁকে বসল, 'না বাপু, তা আমি পারব না। মা মানা ক'রে গেছে এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গুতে। মেজ মাসিমাও বারণ করেছিল। আমি কোথাও যেতে-টেতে পারব না।'

কাকুতি-মিনতি—অনেক কিছুই করা হ'ল। লোভ দেখানো হ'ল নানারকম। বাড়ী যে বিক্রী হয়ে গেছে সে কথা বোঝাবার চেষ্টা করা হ'ল। কিন্তু কেষ্টর মা অচল, অটল। সেজবাবু ত' প্রায় ক্ষেপে ওঠবার দাখিল, শেষে তিনি জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাবার উপক্রম করতেই, বুড়ি দু'হাতে সিঁড়ির থামটা ধরে

মড়াকান্না জুড়ে দিলে। অপ্রতিভ হয়ে ছেড়ে দিলেন সেজবাবু।

'এখন উপায়?' সরব ও নিরব প্রশ্ন চারিদিকে।

রাঙাবাবু রাগ ক'রে বললেন, 'উপায় আর কি! থাক্ পড়ে। আমরা যা করবার সবই করেছি—এখন ত' আর আমাদের কেউ দায়ী করতে পারবে না!'

সেজবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'কিন্তু—চাবি?'

যাঁরা বাড়ী কিনেছেন তাঁরা ভদ্রতা ক'রে তিনমাস সময় দিয়েছিলেন। কাল সেই তিনমাস শেষ হবে। এঁরাও যাবার জন্য প্রস্তুত অবশ্য। কথা আছে বাড়ী খালি ক'রে তালা লাগিয়ে চাবি ওঁরা তাঁদের পৌঁছে দেবেন।

অনেকক্ষণ দুই তরফের কর্তাগিন্নীরা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর সেজগিন্নী বললেন, 'তালা লাগিয়ে দিয়ে যাও —তারা এসে খুলে যা হয় করবেখন্।'

'তারা যদি এখন কিছু দিন না খোলে? বুড়ী যে মরে পচে থাকবে!' রাঙা গিন্নী বলে ওঠেন।

'তবে যা ভাল বোঝ করো?'

পুলিস ডাকা হবে নাকি?

'আচ্ছা, সেই অনাথ আশ্রমের লোকদের বললে কী হয়?' কে যেন প্রশ্ন করলে।

রাঙাবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'উঁহু।—সে তারা স্পষ্টই ব'লে দিয়েছে। অত হাঙ্গামা তারা করতে পারবে না।'

অনেক বিবেচনার পর ঠিক হ'ল যে বড়বাবুই যখন বাড়ীর কর্তা তখন তাঁকে জানানোই ঠিক।

পরের দিন দু'পক্ষই প্রায় এক সময়ে বেরোবেন। তালাটা

আর তাঁরা লাগাবেন না। যাবার সময় রাঙাবাবু গাড়ীটা ঘুরিয়ে ঘটনাটা বড়বাবুকে বলে যাবেন—যা করবার তিনিই করবেন। চাবি দিতে হয় দেবেন—নয়ত নতুন মালিকদের জানিয়ে দেবেন, তারা যা হয় করবে, তাদের গরজে।

পরামর্শটা সকলেরই প্রাণে লাগল। নিশ্চিন্ত হ'ল—কতকটা।

যাচ্ছে এরা কিছুদিন থেকেই। সুতরাং ঘটনাটা কেষ্টর মার গা-সওয়া হয়ে গেছে। সে আর প্রশ্ন করে না। কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে—জানতেও চায় না।

আজকাল যেন কোন কথাই মাথাতে ঢোকেও না ওর—শোনেও কম, শুনলেও ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে। সমস্ত অর্থটা ঠিক বোঝে না।

আজও যাবার সময় রাঙা বউ যখন এসে কানের কাছে চিৎকার ক'রে বললে, 'দোরটা দাও কেষ্টর মা, আমরা চলে যাচ্ছি।' তখনও সে কিছু বুঝলে না, শুধু বললে,—'সে আমি দোব অখন।' বলে বার কতক ঘাড় নাড়লে আপন মনেই।

ওরা চলে যাবার পর সত্যিই এসে হাতড়ে হাতড়ে দোরটা বন্ধ করলে। তারপর তেমনি হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে দেওয়াল ধরে ধরে সিঁড়ির মুখটায় এসে একবার ওপর দিকে চেয়ে আপন মনেই বললে, 'ওমা, এরা সব গেল কোথায়? কই কাউকে ত দেখছি না!'

আস্তে আস্তে তখনকার মত গিয়ে শুয়ে পড়ল কেষ্টর মা।

ক্রমশ অপরাহ্ণ সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে গেল। আব্‌ছা অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারদিকে।

আবার উঠল কেষ্টর মা।

'ওমা, এরা কেউ আলো জ্বালে না কেন রে? ওরে অ কেনা, অ বিন্দী!'

তারপর আপনিই এসে দেওয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে স্যুইচ্‌টা টিপে দেয়।

কিন্তু আলো জ্বলে না।

তিনদিন আগেই লাইন কেটে দেওয়া হয়ে গেছে। এ দু' দিন তেলের আলো জ্বলেছিল। তাও বুড়ী লক্ষ্য করেনি।

'ওমা, আলোটাও যে জ্বলছে না!'

অন্ধকারে খানিকটা জড়ভরতের মত বসে থাকে বুড়ী।

তারপর আবারও বলে 'বাড়ীতে কি কেউ নেই নাকি? গেল কোথায় সব?'

আরও খানিকটা পরে খুন্‌ খুন্‌ ক'রে কাঁদতে বসে, 'আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে!'

এ বেলার মত খাবার কিছু কিছু ওর ঘরেই রেখে দিয়েছিল ওরা—মাটির একটা হাঁড়ি ক'রে, বলে গিয়েছিল, 'এই রুটি তরকারী রইল, খেও খিদে পেলে! বুঝলে?'

কিন্তু সে-কথা বুড়ীর মনে নেই। তাছাড়া সে খাবারও বেড়ালে খেয়ে গেছে। বুড়ী তখন ঘুমোচ্ছিল।

আফিং খাবার সময় হয়েছে।

'ওরে, আমাকে একটু চা দেনা রে!' নাকিসুরে বুড়ী কাঁদে।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে সে।

তারপর সিঁড়ির রেলিংটা ধরে উঠে দাঁড়ায় আস্তে আস্তে, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ওপরে ওঠে।

বৌদের নামগুলো হঠাৎ আজ মনে পড়ে যায়।

'অ বিরজা, অ লীলা বৌ। তোমরা কোথায় গেলে গো!'

দোতলা থেকে তেতলা।

অকস্মাৎ আচ্ছন্ন চৈতন্যের মধ্যে কেমন ক'রে কথাটা ঢোকে। কেমন ক'রে এক সময় বুঝতে পারে যে বাড়ীতে কেউ নেই, সব খালি।

'খালি বাড়ি?···সবাই চলে গেছে?···ওমা, আমি কোথায় যাবো গো?···ওমা, আমার যে বড্ড ভয় করছে গো—'

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে এক সময় একটা ধাপ বুঝতে পারে না—হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে—গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে এসে থামে। একটাও শব্দ করে না বুড়ী, কাঁদেও না। হয়ত কিছু বুঝতেও পারে না।

কেমন যেন ঘুম পায় ওর।

'ও মেজো মাসীমা, চা দেবে না একটু?'

একবার শুধু অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করে।

বড়বাবু অফিস থেকে ফিরে সংবাদটা পেয়েছিলেন। সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল তাঁর রাগে। খানিকটা চেঁচামেচি দাপাদাপিও করেছিলেন—ভাইদের অবিবেচনার জন্য। কিন্তু আর কিছুই সে রাত্রে ক'রে উঠতে পারেন নি।

পরের দিন সকালে নতুন বাড়ীও'লাদের খবর পাঠিয়ে দিলেন

—'বাড়ী তোমরা চাবি দিয়ে এসো গে। বাড়ী খালি।'

যা শত্রু পরে পরে! যা হয় ওরা করুক।

বাড়ীও'লারা বিকেলের আগে আসবার ফুরস্থৎ পেলেন না। তখনও কিন্তু ঢোকা গেল না। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। ফিরে গিয়ে বড়বাবুকে খবর দিলেন তাঁরা।

বড়বাবুকে তখন কথাটা খুলে বলতে হ'ল। বললেন, 'তোমরা ভাই কেউ গাড়ী ক'রে ওকে অনাথ আশ্রমে পৌঁছে দাও। গাড়ী ভাড়া আমি দেব। তোমাদের কথা হয়ত শুনবে, আমরা হাজার হোক্ চেনা লোক কিনা, জন্মে ইস্তক্ আমাদের দেখছে—আমাদের কাছে বায়নাক্কা করে নানা রকম!'

এঁরা তাতে রাজী হননি প্রথমটা। বাদানুবাদও কিছু হয়েছিল।

ফলে এই করতে করতেই রাত হয়ে গেল। কিছুই করা হ'ল না।

পরের দিন সকালে লোকজন এনে দোর ভেঙ্গে এঁরা ঢুকলেন।

সিঁড়ির মুখটাতেই বুড়ী কেষ্টর মা মরে পড়ে আছে। বোধহয় বহুক্ষণ মারা গেছে। পিঁপড়েতে দুটো চোখই খেয়ে শেষ ক'রে ফেলেছে।

ওদিকের টেবিলে কানাকানি আর চাপা হাসি চলছে যুথিকাকে নিয়ে। বেশ বড় জটলা। আবার একটা স্ক্যাণ্ডাল! দাঁতে দাঁত ঘষে সুমিত্রা। ওরা কি এই জন্যেই অফিসে আসে নাকি? একেই ত মেয়েদের দুর্নামের শেষ নেই! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হরিশবাবু দু'বেলা শোনাচ্ছেন, 'অফিসে একটি ক'রে মেয়ে ঢুকছে আর আমাদের কাজ বাড়ছে। মেয়েদের দ্বারা যদি কাজ হ'ত তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না। ঈশ্বর কি তাহ'লে ওদের অবলা ক'রে সৃষ্টি করতেন! সে যা হোক্—ওরা না হয় ভূষণ হয়েই থাক। অনেক ফার্নিচারই ত আছে এমন—কিন্তু ওরা এসে ছেলে-গুলোর মাথা খাচ্ছে এইতেই যে আপত্তি। এদের দিয়েও যে কোন কাজ পাচ্ছি না।'

সুমিত্রা ওদিকে তাকাবে না প্রতিজ্ঞা ক'রে খাতার ওপর ঘাড় গুঁজে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু কানে কথার টুকরোগুলো এসে যেন বেঁধে তীরের মত। নিবারণ বলছে, 'হিরণটার পেটে পেটে এত!' সুরেশ তার জবাবে বলছে, 'হিরণের দোষ দিই না ভাই —যুথিকা মেয়েটি সোজা নয়, নাছোড়বান্দা একেবারে! দিনকতক আমার পেছনে লেগেছিল কিনা —আমি জানি!' ফোঁস্ ক'রে উঠল চারু, 'তুই থাম্ সুরেশ। অমনি নিজে খানিকটা বাহাদুরী নেবার চেষ্টা। যুথিকার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—তোর পেছনে লাগবে!' রাগলে তোৎলা হয়ে যায় সুরেশ, 'মা—মাইরি ব—বলছি। তু—তুই র—রবিকে জ—জিগ্যেসা কর।' রবি অম্লানবদনে মুখের ওপরই বলে দিলে, 'আমি ত জানতুম তুই-ই ওকে বিরক্ত করিস যেখানে সেখানে।'

ডেপুটি ডাইরেক্টার জেনারেলের টি-এ বিল। সাবধানে দেখতে হবে। সুমিত্রা টাইম-টেব্‌ল্‌ খুলে মাইলের হিসাব দেখে। ওদিকে কান দিলে চলবে না। এ কাজটা হরিশবাবুর করার কথা —কিন্তু তিনি ওকেই ভার দিয়েছেন, 'বুঝে-সুঝে নাও সব কাজ। কোন্‌দিন কি করতে হয় বলা কি যায়?…তোমার মাথা ত ভাল—চাইকি এস-এ-এসটা যদি পাস করতে পারো ত—। মেয়ে-দের অবিশ্যি হয় না। অঙ্কে যা মাথা!' নিজেই নিজের মন্তব্যের উত্তর দিয়ে শেষ করেছেন।

ওঁর এ আস্থার মর্যাদা রাখতেই হবে।

তবু রাগটা ও দমন করতে পারে না। প্রাণপণে চেপে থাকা সত্ত্বেও অনুভব করে যে ঠোঁটের স্নায়ুটা দপ্‌ দপ্‌ করছে। কাঁপছে ভেতরে ভেতরে। অপমান? তাই অন্তত ও বিশ্বাস করতে চায়। এই দু'একটা মেয়ের জন্যে ওদের সকলের অপমান! কাজ ত কেউই করে না—সমস্ত অফিসটার মধ্যে সে আর বেলা, এই দু'জন যা কিছু কিছু করে—বাকী সবাই ব্যাগের মধ্যে ক'রে নভেল আনে আর দশ মিনিট অন্তর নাকের ডগায় পাউডার বুলোয়—ছোট্ট আয়না বার ক'রে। আর যা করে, তরুণ ছেলেদের সঙ্গে ইয়ার্কি—ফষ্টিনষ্টি।…সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় সুমিত্রার।

ছেলেগুলোও তেমনি।

কী আছে ঐ যুথিকার? সুমিত্রার চেয়ে ঢের বেশি কালো। হ্যাঁ—পাশে বসে মিলিয়ে দেখেছে সে। চোখ দুটো ওরই মধ্যে একটু ড্যাবা ড্যাবা—আর দাঁতগুলো বেশ সাজানো। তা হাসলে সুমিত্রাকেও ভাল দেখায়। বয়সটা কম এই যা—

কতই বা কম? কুড়ি বাইশের ত কম নয়। আই-এ পাস্‌

ক'রে এসে ঢুকেছে, মেয়েরা কি আর ষোল বছরে ম্যাট্রিক পাস করে?···কিছুতে না। তার প্রমাণ ত সে নিজেই—।

নিজের বয়সের হিসাবটা মনে পড়ে যায়, উনত্রিশ বছর সাত মাস—গোনা-গাঁথা। অনেকেরই বয়সের হিসাব গুলিয়ে যায়। ওরও যদি যেত! সুমিত্রা বাঁচত তা হ'লে। কী কুক্ষণে যে ঠিক ঐ দিনটিতে ও জন্মেছিল। ওর দাদার যে দিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ—সেই দিনে ওর জন্ম। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে অষ্টপ্রহর ঐ কথাই শুনছে এবং—সেই সঙ্গে সেই বিশেষ তারিখ ও দিনটা। দাদার এই অর্থহীন রসিকতা সুমিত্রার পক্ষে কী বেদনাদায়ক হ'তে পারে তা বোঝবার মত বুদ্ধি ভগবান তাকে দেননি। মেয়েদের বয়স স্মরণ করায় যে দায়িত্ব আছে অভিভাবকদের, সে কথাটাও দাদা কখনও ভেবে দেখেনি। মনে করিয়ে দিতে পারত খুবই—কিন্তু আত্মসম্মানে বেধেছে ব'লে প্রত্যেকবারই উদ্যত রসনাকে দমন করেছে সুমিত্রা।

দাদা নিজে বিবাহিত। সাত-আটটি সন্তান ওর। যা রোজগার করে তাতে নিজের সংসার চলে না। সে বোনের বিয়ে দেবার কথা কল্পনা পর্যন্ত করেনি। দু'একজনে দু'একবার মনে করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে বাবার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে সরে পড়েছে, 'বাবার মেয়ে, বাবা বুঝবেন! আমার নিজের তিনটে মেয়ে কেমন ক'রে পার করব তার ঠিক নেই, তা আবার বাবার মেয়ে!'

নিজের বোনকে বাবার মেয়ে ব'লে উল্লেখ করার রসিকতায় হেসে উঠত প্রতিবারেই—হো—হো—হা—হা—!

অপমানে সুমিত্রার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে যায় ওর ঐ হাসিতে, ইচ্ছা করে মাথাটা ধরে গুঁড়িয়ে দেয় ওর—

বাবা যখন রিটায়ার করেছেন তখন ইচ্ছা করলে বিয়ে দিতে পারতেন সুমিত্রার। ফাণ্ডের টাকাগুলো ছিল, সুমিত্রাও এমন শীর্ণ ও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি। প্রথম কৈশোরের শ্যামল সরসতা একটি অপরূপ লাবণ্যে ঘিরে ছিল ওর তনুলতাকে। কিন্তু তখন তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সে কথাকে—'পনেরো বছরে বিয়ে। পাগল নাকি তুমি বড় বৌ!' আসলে সদ্য-পাওয়া অত-গুলো টাকা তখন তিনি একটু অনুভব করতে চেয়েছিলেন। সামান্য কেরাণীর সুদূর স্বপ্নের অতীত অতগুলো টাকা। অন্তত সুমিত্রার তাই বিশ্বাস।

তারপর সে টাকার অঙ্ক ক্ষীণ হয়ে এল। মধ্যে কী একটা ব্যবসা করতে গিয়েও বাবা হাজার চারেক টাকা নষ্ট করলেন। আর যা বাকী রইল তা সংসারের নিত্য-অনটনে দু'টাকা চার টাকা ক'রে খরচ হ'তে হ'তে একদিন আর কিছুই রইল না। দাদার যা মাইনে তাতে তার খরচই চলে না। শেষে প্রতিদিনের হাঁড়ি চড়াই হয়ে উঠল সমস্যা।

সুমিত্রা ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়ে ইস্কুল ছেড়েছিল। মার শরীর খারাপ, সংসারের কাজ দেখে কে? দুটো ছোট ছোট ভাই। দিদি নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। ছোড়দি যদিও বিধবা তবু তাঁর শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা ভাল ব'লে বাবা আনতে চান না এখানে —'এখানে এলে যদি চিরদিনের মত ঘাড়ে পড়ে? খেতে দেব কি?'…তারপর দাদার বিয়ে হ'তে জোর ক'রে আবার ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল সুমিত্রা। আবার ম্যাট্রিক পাশ ক'রে পড়া বন্ধ হয়। বাবার আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, মেয়ের কলেজের খরচা যোগান। মাও বললেন, 'আর গুচ্ছের পড়ে কি হবে।

এবার মেয়ের বিয়ের যোগাড় ছ্যাখো—'

জোগাড় দেখলে অবশ্য দেখা যেত। তখনও কোন মতে বিয়ে দেওয়া চলত। গরীবের মেয়ের কি বিয়ে হয় না? পাড়ার নেড়ু-বাবু সাতাশ টাকা মাইনের বেয়ারা কোন্-যেন-সদাগরী অফিসে। তবু তিনিও ত মেয়ের বিয়ে দিলেন। কিন্তু তার বেলা সে-রকম উদ্যোগী হয়ে পরিশ্রম করবে এমন লোক ছিল না। বাবা তাস আর তামাক—সেই সঙ্গে পাড়ার অকর্মণ্য বৃদ্ধদের সঙ্গে আড্ডা —এই নিয়েই থাকতেন। স্ত্রীর অনুযোগের উত্তরে বলতেন, 'বিয়ে বললেই বিয়ে? ঐ ত তোমার কালো ভূত মেয়ে—না। রূপ না আমার রূপো, বর জোটাই কোথা থেকে? তাও ত সবাইকে ব'লে রাখছি, আর কি করব, রাস্তায় রাস্তায় পাত্তর্ চাই পাত্তর্ চাই ব'লে ঘুরে বেড়াব পাগলের মত?'

দাদা ত চিরদিনই উদাসীন। সে দেখে তার স্ত্রীকে সাহায্য করার লোক, মা দেখেন তাঁর সংসারের ভরসা। ব্যস্! সবাই নিশ্চিন্ত।

অবশেষে সুমিত্রাই উদ্যোগী হয়ে পাড়াতে একটা টিউশানী জুটিয়ে নিলে, তারপর ভর্তি হয়ে গেল কলেজে। মাস কয়েক পরে চাকরীও জুটল একটা। ভোর ছ'টায় বাসী রুটি খেয়ে কলেজ যেত, সেখান থেকে সোজা অফিস—বাড়ী ফিরে সংসারের কাজ, রান্নাবাড়া। মা বুড়ো হয়েছেন, দুপুরটা চালান একরকম ক'রে—সন্ধ্যায় একেবারে অনড় হয়ে পড়েন। বৌদির কোলে চিরদিনই ছোট ছেলে। সুতরাং—

এখন ত আর তার বিয়ের কথা মুখে কেউ উচ্চারণই করে না। স্নেহ যে করে না তা নয়। বৌদি চিরদিনই ভালবাসে।

কিন্তু সে তার ছেলেমেয়ে ধরার লোক বলে। দাদা-বাবা-মা সবাই ভালবাসে ; উপার্জনে উপবাস করা বন্ধ হয়েছে। ছোট ভাইদের পড়াশুনো চলছে। এক কথায় সুমিত্রার এই সরকারী চাকরী হওয়াতে ওঁরা নিশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছেন। সংসারটা অপেক্ষাকৃত মসৃণভাবে চলেছে। দাদা ত এমনভাবেই কথা বলে যে সুমিত্রার আর বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়—এবং সে কথাটা নিশ্চয় সুমিত্রাও এতদিনে বুঝেছে—এটা স্বতঃসিদ্ধ।···

এর আগের ঔদাসীন্য বিঁধেছে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি বেঁধে এখনকার এই নির্মম স্বার্থপরতা। ওরা কি ভাবে সুমিত্রাকে ? তার আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা সব কি বাইরের চেহারাটার মতই শুকিয়ে গেছে ? তাও যে গেছে, সে-ত ওদেরই অত্যাচারে। খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই—উদয়াস্ত কঠিন পরিশ্রম। আর তার ফলে ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্য। শেষেরটাই তাকে আরও বেশি ক'রে শুকিয়ে দিয়েছে। নইলে বৌদিও ত তার বয়সী—হয়ত কিছু বড় হবে—তার ওপর আটটি সন্তানের মা। তবু এখনও কেমন ঢলঢলে আছে ওর মুখখানা। ওর বন্ধুরাও কেউ এমন হয়ে পাকিয়ে যায়নি।

নাঃ—এসব কি ছাইভস্ম ভাবছে সে ? ছি ছি—এ বিলটা আজকে চেক্ ক'রে না দিতে পারলে হরিশবাবু কি ভাববেন ! মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে, কান দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে আসা যাক্।

সুমিত্রা উঠে পড়ে। ফিরে আসবার পথে চোখে পড়ে বারান্দায়

অসিত দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে—অতসী যেতে যেতে মুচকি হেসে গেল। দু'জনেরই চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল নিমেষে। বহু পরিচিত এ চাহনি—

এমন কি অতসীও?

ওর চামড়াটা দু-পোঁছ বেশি ফরসা এটা ঠিক। কিন্তু বয়স ত সুমিত্রার চেয়েও বেশি···

বুকের মধ্যে যে দীর্ঘনিঃশ্বাসটা প্রাণপণে দমন ক'রে রেখেছিল সেটা এবার বেরিয়ে আসে। কিছুতেই আর চেপে রাখতে পারে না। মনকেও এতক্ষণ ধরে যে প্রবঞ্চনা ক'রে চলেছে আর সেটা সম্ভব নয়। হ্যাঁ—সে ঈর্ষিত। কৈ, এতকালের মধ্যে তার দিকে ত কেউ ফিরেও তাকাল না? তার সঙ্গে রসিকতা করতে চায়, ইয়ার্কি দিতে চায় এমন কি কেউ নেই? একজন মাত্র তাকে নির্জনে পেলে কিছু অশ্লীল রসিকতা করেন—তবে সে আরও অপমান। তিনকড়িবাবুর রিটায়ার করারও বয়স পেরিয়ে গেছে, এখন এক্সটেনশানে আছেন।

আশ্চর্য! আজ না হয় সে এমন রোগা আর কাঠি-মত হয়ে গেছে; যখন তা ছিল না, তখনও ত কোন ইতিহাস ওর কোথাও রচিত হয়নি। পাড়ার অনেক মেয়ের অনেক কাহিনী সে জানে—আজকাল ত কথাই নেই, ক্লাস এইট্ পেরোলেই এবাড়ী থেকে ওবাড়ী এবং ওপর থেকে নিচে চিঠি লেখালেখি। কোন কোন ক্ষেত্রে চিঠিরও বেশি।—শুধু কি বিধাতা তারই চরিত্র নির্মল রাখবার জন্য বিশেষ একটি অদৃশ্য প্রহরায় ঘিরে রেখেছেন তাকে? রূপকথার রাজপুত্র না আসুক, পাড়ার কোন বকা ছোকরাও ত কোন দিন তার জানলা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়েনি, তাকে দেখে

দেয়নি শিস। এমন কী কাঠিন্য তার মুখে চোখে মাখানো আছে? এমনি কি গম্ভীর এবং ভয়াবহ সে?

ঠং ঠং ক'রে চারটে বেজে যায়? হরিশবাবু হেঁকে বলেন, 'কৈ গো সুমিত্রারাণী, হ'ল তোমার? আমি ও ফাইলটা ক্লোজ করতে চাই যে। কোন্ দিন আবার শালা হুড়ো দেবে—'

সুমিত্রা অপরাধীর মত এসে দাঁড়ায়, 'বড্ড মাথা ধরে উঠেছে কাকাবাবু, কিছুতেই যেন কাজ এগোচ্ছে না। আমি ক'রে দিয়ে যাবো যত দেরিই হোক্—'

হরিশবাবু মুখ তুলে তাকাতেই ওর মুখের অপরিসীম বিবর্ণতা তাঁর চোখে পড়ে, 'ইস্ সত্যিই তো—মুখচোখ যে শুকিয়ে গেছে একেবারে। য়্যাস্পিরিণ খাবে নাকি? আছে আমার কাছে।··· ও বিল থাক্ গে আজ, এখন বরং বাড়ী চলে যাও। কাল ফার্স্ট আওয়ারে ক'রে দিও। ইস্—তোমরা যে মোটে শরীরটার দিকে নজর দাও না। যত বলি একটু ক'রে ত্রিফলার জল খেয়ো ভোর বেলা—'

বাকী কথাগুলো আর শোনে না সুমিত্রা। সত্যিই ওর মাথা ধরে উঠেছে ভীষণ। কেন এমন হ'ল কে জানে। বিশেষ ক'রে আজই ওর চিত্ত কেন এমন উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ল? এসব আঘাত ত নিত্য-নৈমিত্তিক!

বাড়ী আসতেই বাবা প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'কি রে, এত সকাল সকাল?'

উত্তর দিলে না সুমিত্রা। হাতে সাজা হুঁকো এবং সামনে

চায়ের পেয়ালা। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবন। সে নিজেই নিরুপদ্রব ক'রে দিয়েছে ওঁর জীবন! ওপরে উঠতে মা বললেন, 'হ্যাঁরে তোর চোখমুখ এমন বসে গিয়েছে কেন? অসুখ করেছে নাকি? কৈ আয় ত দেখি—'

অন্যদিন হ'লে ওঁর এই উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে সুমিত্রার মনও আর্দ্র হয়ে উঠত কিন্তু আজ যেন আরও বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল। সে সংক্ষেপে শুধু উত্তর দিলে, 'আমার কি অসুখ করে মা? না করতে পারে? তাহ'লে তোমাদের চলবে কি ক'রে?'...পাশ কাটিয়ে তেতলায় যাবার চেষ্টা করে সে। ওপরে দু'টি মাত্র ঘর, একটি দাদার আর একটি তাদের, অর্থাৎ বাবা মা দু'টি ভাই এবং সে, এই সব ক'জনের। অনেকদিন ধরেই অসহ্য হয়ে উঠেছে, সম্প্রতি নিজে কিছু টাকা খরচা করে ওপরের চিলকুঠরীটা চলনসই ক'রে নিয়ে তাতেই আশ্রয় নিয়েছে—একরকম জোর ক'রেই। মা আপত্তি করেছিলেন, 'আইবুড়ো মেয়ে একা ছাদের ঘরে থাকবি কি? ওমা—লোকে কি বলবে?'

সুমিত্রাও চোখা উত্তর দিয়েছিল, 'কী বলবে? ছাদ ডিঙ্গিয়ে আমার ঘরে লোক উঠবে? না কি ভূতে ধরবে? তোমার যা মেয়ে, ভূতেও ছোঁবে না মা!...সে যে যা বলে বলুক, সারাদিন খেটেখুটে একটু একা-একা থাকতে না পারলে পাগল হয়ে যাবো!'

বাবা মা আর কিছু বলতে সাহস করেন নি। অর্থ উপার্জন করতে শুরু করলেই মেজাজ দেখাবার অধিকার জন্মায়—এ ত সবাই জানে!

বৌদির ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তার পুলকিত কণ্ঠ-স্বর শোনা গেল, 'ওমা ঠাকুরঝি আজ এরই মধ্যে এসে গেছ।

বাঁচলুম! তোমার ভাইঝিকে একটু সামলাও দিকি, কাপড় কাচতে পর্যন্ত যেতে পারছি না!'

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল সুমিত্রার। সে ওপরে উঠতে উঠতেই বললে, 'আমি এখন আর কিছুই পারব না বৌদি, বড্ড মাথা ধরেছে—'

'আবার মাথা ধরল! বেশ।...মাথাধরা ভাই আজকাল যেন তোমার হাতধরা হয়ে উঠেছে!'

'হ্যাঁ বৌদি, আমি ইচ্ছে ক'রেই ধরাই।'

অপ্রসন্নকণ্ঠে বৌদি বললে, 'আমি কি তাই বলছি!'

কিন্তু শুয়ে থাকারই বা উপায় কি? এক সময় ত উঠতেই হয়! দাদা আসবে, চা জলখাবারের পাট আছে। ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যে থেকেই খাবো খাবো করবে। একরাশ আটা মাখতে হবে। মা দয়া ক'রে কুটনোটা কুটে রেখে দেন তাই। বৌদি রান্নাঘরে নামে আটটারও পর। কোলের মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, বেশভূষা ক'রে নেমে এসে শুধু রুটি ক-খানা বেলে দেয়।

সুমিত্রা অফিসের কাপড়-জামা ছেড়ে নেমে এসে খুব কড়া ক'রে এক কাপ চা তৈরী ক'রে খায়—তারপর রান্নাঘরে ঢোকে প্রতিদিনকার মতই। আর নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ মেলে না —চিন্তা কল্পনাও একান্ত অনবসরের কোন্ ছায়ায় মিলিয়ে যায় ক্রমশ।

অবসর মেলে একেবারে সব রান্না সেরে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে —রাত ন'টারও পর। রান্নাঘর পর্যন্ত ধুয়ে সে নিজে যায় গা ধুতে। এটা ওর প্রতিদিনকার অভ্যাস। রান্নার তেল যেন সর্বাঙ্গে লেগে থাকে নইলে—তেল আর গন্ধ। আজও গা ধুয়ে এসে প্রসাধন করতে বসল। একটু যেন বিশেষ ক'রেই প্রসাধন করলে,

কেন, তা সে নিজেও জানে না। তারপর বাইরে বেরিয়ে তারাভরা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেললে। এইবার ঘণ্টাখানেক ওর ছুটি। নিরন্ধ্র অবসর। বাবা আড্ডা থেকে ফেরেননি, দাদা ক্লাব থেকে আসবে দশটারও পরে। বৌদি এইসময় একটু ঘুমিয়ে নেয়, শেষরাত্রে ছেলেমেয়ের উপদ্রবে কোন দিনই ভাল ঘুম হয় না।···অন্যদিন এ সময়টা সে অফিস-লাইব্রেরী থেকে-আনা বই পড়ে কাটায়। কিন্তু আজ কিছুই ভাল লাগছে না। বইও না।

সমস্ত বাড়ীটা নির্জন নিস্তব্ধ। শুধু ওদের একতলার ভাড়াটেদের ছেলেটি পরীক্ষার পড়া পড়ছে। নিচের দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে ওরা—সিঁড়ির নিচের খাঁজটুকু চটের পর্দা টাঙিয়ে ছেলেটা পড়ার ঘর ক'রে নিয়েছে। পড়া !···মনে হলেও হাসি পায় সুমিত্রার। দুবার ফেল করেছে আই-এস-সিতে, এইবার নিয়ে তিনবার হবে পরীক্ষা দেওয়া। বিশ্ববকাটে ছেলে বীরু, লম্বা একহারা গড়ন সিগারেট বিঁড়ি ত মুহুর্মুহুঃ চাই—অন্য ব্যাপারেও পরিপক্ক। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই ও-পাড়ায় কী একটা এমন কেলেঙ্কারী করেছিল যাতে আর ওখানে থাকতেই পারেননি ওর বাবা-মা। পুলিশ পর্যন্ত গড়াত, অনেক কষ্টে সেটা বেঁচেছে। এখানে এসেও নিশ্চেষ্ট নেই বলা বাহুল্য—সুমিত্রা অনেক চিঠি লেখালেখির ইতিহাস জানে। মোড়ের বাড়ীর নন্দার দাদা রাত ন'টার সময় ধরে কী মারটাই দিলে সেদিন। ওর বাবা শাসন করতে পারেন না—অথচ আশা করেন যে ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে।

বীরু !

কথা কইতেও ঘৃণা হয় সুমিত্রার—ওর সঙ্গে। আজ পর্যন্ত

নিতান্ত বাধ্য হয়েই বোধ হয় গোটা-পাঁচ-ছয় শব্দ উচ্চারণ করেছে ওকে লক্ষ্য ক'রে।

একঝলক দক্ষিণা বাতাস হঠাৎ আস-পাশের গাছপালাকে মর্মরিত ক'রে বয়ে যায়। অসময়ে উষ্ণ বাতাস। কেমন যেন শিউরে ওঠে সুমিত্রার গা-টা।

সহসা বীরুর সম্বন্ধে আজই বা ওর কৌতুহল উগ্র হয়ে ওঠে কেন?···ওকে কখনও কাছ থেকে দেখেনি। কী আছে ওর ঐ চোয়াড় চোয়াড় চেহারায়? নন্দা নাকি একরাশ চিঠি লিখেছিল ওকে।

এক-পা এক-পা ক'রে কখন্ এক সময়ে সুমিত্রা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। একতলায় গিয়ে ভাড়াটেদের দিকের দরজাটা সন্তর্পণে ঠেলে। ভেজানোই ছিল— খুলে গেল নিঃশব্দে। ভেতরে ঢুকে চটের পর্দাটা সরিয়ে একসময় ও সত্যিই ঢুকে পড়ল বীরুর ঘরে—

সমস্ত ঘরটা বিড়ির ধোঁয়া ও গন্ধে পূর্ণ। ওকে দেখে যেন ভুত দেখার মতই চম্‌কে উঠে চট্ করে অপূর্ব কৌশলে বিড়িটা নিভিয়ে ফেলে পাশের দেওয়ালে চেপে। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'এ কি সুমিত্রাদি? হঠাৎ এত রাত্রে? মাকে ডেকে দেব?'

'না না—নিশ্চয়ই একটু বিশ্রাম করছেন এখন, ডেকে কাজ নেই। এমনিই এলুম—কি পড়ছ দেখতে। বোস বোস, তোমার পড়ার ব্যাঘাত করতে চাই না,—'

সে জোর ক'রেই ওর কাঁধে হাত দিয়ে বসিয়ে দেয়, তারপরও কিন্তু হাতখানা থাকে বীরুর কাঁধেই—সরানো হয় না।

বীরু কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে। সে একটু বোকার মত

হেসে বলে, 'বাঃ রে, আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি বসে থাকব।...এখানে কিছুই নেই ছাই। না হয় চলুন ওঘরেই—মা হয়ত ঘুমোননি একেবারে—'

'না না থাক্। কেন, আমি থাকলে কি অসুবিধা হচ্ছে?' আল্‌গাভাবে হাসে সুমিত্রা। কিন্তু মনে হয় ঠোঁট দুটো কান্নার ধরণে বেঁকে যাচ্ছে—নিজে নিজেই অনুভব করে সেটা। বীরুর কাঁধে রাখা হাতখানা কাঁপছে অল্প অল্প। অনভ্যস্ত ভূমিকার বিড়ম্বনায় স্নায়ুগুলো যেন অবশ হয়ে আসে।

টুক্‌রো টুক্‌রো আলাপ—কিছুতেই দানা বাঁধে না। বেশ বুঝতে পারে সুমিত্রা, বীরু কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছে।

ও নিজেও ঘেমে ওঠে। আরও মিনিট পাঁচ-ছয় বৃথা চেষ্টা ক'রে সুমিত্রা উঠে পড়ে, 'আচ্ছা তুমি পড়ো। সময় নষ্ট করলুম খানিকটা!'

'না না, তা নয়। তবে আপনি আসাতে আমি ভেবেছিলুম কী না কি, বিপদ-আপদই হ'ল বুঝি। আপনি ত এন্‌নি কারুর সঙ্গে কথাই কন্‌না—বাবা, যা গম্ভীর!'

সৌজন্যের কথা। কিন্তু চোখে যে হাসির আভাস ওর লেগে ছিল, তাতে কি বিদ্রুপ নেই? কাল কি ওর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে এই কথাই বলবে না, 'ওপরের বাড়ীওলাদের সেই কেল্‌টে ছুঁড়ীটা কাল রাত্তিরে জমাতে এসেছিল, মাইরি!'

আড়াল থেকে শুনে শুনে ওদের কথা বলার ধরণ ওর মুখস্থ হয়ে গেছে। কেন গেল ও, কেন এই অপমানটা হ'তে গেল স্বেচ্ছায়?

ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে চোখে জল এসে গেল সুমিত্রার।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সত্যিই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল সে।

খানিকটা পরেই ওদের চাকর রাখাল এসে পৌঁছল দেশ থেকে। রাখাল ওর দাদার অফিসে কাজ করে, ওদের বাড়ীতে থাকে এবং খায়। তার বদলে ছ'বেলা যতটা পারে কাজকর্ম ক'রে দেয়। সুমিত্রার চাকরী হওয়ার পর থেকেই এই ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে।

রাখাল মাসখানেকের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল। মুড়ির ছাতু, নতুন গুড় কত কি এনেছে। ততক্ষণে দাদা ও বাবাও এসে গিয়েছেন। খুব খানিকটা হৈ-হৈ হ'ল। রাখাল বললে, 'আমি যা ছাতু এনেছি তাই খাবো এখন—দিদির ত রান্নাটান্না সারা।'

সুমিত্রা জোর দিয়ে বললে, 'না না, রুটি বেশি আছে। সত্যিই বেশি আছে। তা ছাড়া আমার শরীরটা ভাল নেই, আমি ত কিছু খাবোই না।'

সে জোর ক'রে নিজের ভাগের খাবারটা রাখালকে খাইয়ে দিলে। রাখাল বললে, 'আপনি মিছে ক'রে বললেন দিদি, পাছে আমি না খাই।'

মিষ্টি হেসে সুমিত্রা বললে, 'বললুমই বা রাখাল। সত্যিই যদি তোমার দিদি হ'ত—তুমি হঠাৎ গিয়ে পড়লে না খাইয়ে সে নিজে খেতে পারত?'

উত্তর দিতে গিয়ে রাখালের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে, 'সে কথা আমি দেশে গিয়ে সবাইকে বলেছি দিদি, যে আমায় দিদিমণি

যা যত্ন করেন, অমন আমার আপনার লোকেও কেউ করতে পারত না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই যে-যার ঘরে চলে যায়, রাখাল রান্নাঘর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার ক'রে এখানেই শোবে। চাকরদের শোবার মত ঘর আর নেই এখন। রান্নাঘরেই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

ঘর ধুতে ধুতে রাখাল পেছনে ছায়া দেখে চম্‌কে ওঠে—সুমিত্রাই আবার কখন নিচে নেমে এসেছে—!

'কী চাই দিদিমণি? জল? বললেন না কেন ডেকে—দিয়ে আসতুম!'

'না না। এমনিই। ঘুম আসছে না তাই। তোমার কাছে তোমাদের দেশের খবর সব শুনতে এলুম।'

টুক্‌রো টুক্‌রো খবর দেয় রাখাল ঘর মুছতে মুছতে। একুশ বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে—দেশে গিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি ক'রেই এসেছে। তবু সুমিত্রা যখন কাছে গিয়ে ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে বললে, 'যাই বলো রাখাল, তুমি একটু রোগা হয়েই এসেছ!' তখন একবার নিজের দিকে তাকিয়ে রাখালও তা স্বীকার করলে, 'বড্ড রোদে রোদে ঘুরেছি কিনা—তাছাড়া ঘরদোরগুলো নিজেই সারলুম। বাবা ছিষ্টির কাজ জমিয়ে রেখেছিলেন।'

অবশেষে রাখাল যখন বিছানা পাততে শুরু করলে, সুমিত্রাকে চলে আসতে হ'ল। আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন অজুহাতই নেই। তাছাড়া শোভনতা ও সঙ্গতির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ!

কিন্তু তবু সে তখনই শুতে যেতে পারল না। অন্ধকারে

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ছাদে, একা একা—নিশাচরী প্রেতিনীর মত।

অনেক্ষণ পরে খুট ক'রে কি একটা শব্দ হ'ল নিচে! ওদেরই সদর দরজা খোলার মত। হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলে—হ্যাঁ, ওদের বাড়ী থেকেই কে একজন বেরিয়ে গেল খুব সন্তর্পণে। একবার মুখ তুলে ছাদের দিকে তাকালেও—তবে অন্ধকারে বোধ হয় সুমিত্রাকে দেখতে পেলে না। কিন্তু সুমিত্রা চিনতে পারলে—রাখাল।

ওধারে দাসগুপ্তদের বাড়ীরও খিড়কীর দোর খুলে গেল—প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে এল এক ছায়ামূর্তি। মধ্যেকার খালি মাঠে বসে তু'জনে কি গল্প হ'তে লাগল। রাখাল একটা বিড়িও ধরাল। সেই আলোয় সুমিত্রা দেখল তার অনুমানই ঠিক—দ্বিতীয় প্রাণীটি গুপ্তদের ঝি চপলা।

মিনিট কতক গল্প করার পরই তুজনে উঠে পড়ল। চপলা ফিরে গেল ওদের বাড়ী, রাখালও ফিরে এসে সাবধানে দোর বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল। খুব সামান্য শব্দ হ'লেও সুমিত্রা ওর নিজের ঘরে এসে দোর দেওয়াটা পর্যন্ত শুনতে পেল।

সামান্য ব্যাপার। ওদের এ প্রণয়রহস্য অনেকদিনই অনুমান করেছে সুমিত্রা, আগে আগে কৌতুকই অনুভব করেছে বরং—কিন্তু আজ কে জানে কেন অসহ্য ক্রোধে জ্বলে উঠল। খানিকটা চুপ ক'রে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থেকে তরতর্ ক'রে নেমে এল নিচে। বারান্দায় পড়ে মায়ের মাথার কাছে জানলা থেকে চাপা গলায় ডাকলে, 'মা মা শোন—ওঠ একবার!'

মা তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে উঠে দোর খুলে দিলেন, 'কিরে ব্যাপার কি? কী হয়েছে মা?'

'তোমাদের ঐ রাখাল মা, ওকে কিছুতেই রাখা চলবে না। ওকে সকালে উঠেই তাড়িয়ে দেবে—'

'কেন—কেন, হ'ল কি ?'

'ওর স্বভাব চরিত্র ভারী খারাপ। একেবারে যা-তা—ওদের বাড়ীর ঐ চপলা—। ছি ছি !'

ঘৃণায় কথাটা শেষ করতে পারলে না।

মা কিন্তু অতি সহজেই কথাটা নিলেন, 'ও, এই ! সর্ব রক্ষে। আমি বলি না জানি আর কি ! ওসব ত বাছা আছেই। বলি ভদ্দরলোকদেরই স্বভাবচরিত্র পাহারা দেওয়া যায় না—তা চাকর-বাকর। নে, নে—যা তুই শুয়ে পড়গে যা। তিলকে তাল ক'রে মাথা গরম করিস্ নি।'

তিনি একরকম ঠেলেই মেয়েকে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন।

নিজের ঘরে ফিরে এসে সুমিত্রা বিছানায় একরকম আছড়েই পড়ল। সারাজীবনের সমস্ত হতাশা, সমস্ত ব্যর্থতার বেদনা যেন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে আজ অশ্রুর আকারে বেরিয়ে এল। কঠিন ঠাণ্ডা বিছানাতে আকুল হয়ে মাথা ঠুকতে লাগল সুমিত্রা। বেঁচে থাকার এ যন্ত্রণা সে আর সইতে পারছে না। হে ঈশ্বর, সে মরতে চায় শুধু এখন !